হৃদয়ের রং

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স

কেন্দ্রালয় - ১৩ এ, ফার্ন রোড, কলি-১৯ :: বিক্রয়কেন্দ্র-৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

উপন্যাসখানি মাসিক পত্র চতুষ্পর্ণায়
দর্পন নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখকের অন্যান্য বই

আলোর ভুবন

বারোঘর এক উঠোন

নিশ্চিন্তপুরের মানুষ

সমুদ্র অনেক দূর

মীরার দুপুর

শ্বাপদ শয়তান

ও রূপালি মাছেরা

চন্দ্রমল্লিকা

পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা

গ্রীষ্মবাসর

॥ এক ॥

না, তার কথা আমার মনে ছিল না।

তার কথা মনে রাখব না বলে আমি মনকে তৈরী করছিলাম।

কষ্ট হচ্ছিল। বুকের ভিতর যন্ত্রণা হচ্ছিল।

একটি মুখ, একটি মানুষকে ভুলে থাকতে পারার মধ্যে আনন্দ আছে। কিন্তু সেই আনন্দ পাবার জন্য আমাকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে। হয়তো এখন সেই কৃচ্ছ্রসাধনের পালা চলেছে। তাই এত কষ্ট, এত দুঃখ।

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি পৌঁছতে কতটা দেরী জানতে একটি ঘড়ির সন্ধানে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিলাম। অথচ এই স্টেশনের সব কিছু আমার জানা। কোথায় টিকিট দেয়—টিকিট ঘরের লাগোয়া স্টেশন মাস্টারের কামরার কোন্ দিকের দেওয়ালে ঘড়ি ঝুলছে, দরজার কোন কোণায় দাঁড়ালে বারান্দা থেকেই কাঁটা দুটো চোখে পড়বে আমার মুখস্থ।

আমি চোখ বুজে বলতে পারি উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মের কতটা জায়গা মেহেদীর বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। একটা পেঁপে গাছ আছে ওখানে। পেঁপে গাছের ওপাশে ঢালু জমির ওপর বাঁশ-বাখারীর ছোট একটা ঘর। পরেশের চায়ের দোকান। ঘরের চালের ওপর প্রকাণ্ড নিমগাছ ডালপালা ছড়িয়ে এত এত ছায়া ঢেলে দিয়েছে।

অথচ স্টেশনের চৌহদ্দীর ভিতর রেলওয়ের সরকারী চায়ের স্টলও আছে। এখানে কাপে করে খদ্দেররা চা খায়। পরেশের দোকানে মাটির ভাঁড়। তবু পরেশের হাতের চা খেতে মানুষ তার দোকানে ভিড় করে বেশি।

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে কথাগুলো ভাবছিলাম। কতদিন আমি এখানে এসেছি। এম্নি। বেড়াতে বেড়াতে পরেশের দোকানে বসে চা খেয়েছি। গেট-এ দাঁড়িয়ে ঐ যে লম্বা মতন মানুষটি টিকিট পরীক্ষা করছে, সে আমায় জানে। আমাকে অনেকদিন এই প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। টিকিট ঘরের সেই চশমা-পরা গোলগাল মানুষটি আমাকে চেনে। এই ছোট স্টেশনের সব কিছু আমার পরিচিত।

স্টেশন ঘরের দেওয়ালে কয়টা পোস্টার ঝুলছে—কোনটা "স্বল্প সঞ্চয়ের" কোনটা "রেড-ক্রশের" কোনটা "টি বি সীলের" আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে পারব। আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি টিকিট ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটি লম্বা বেঞ্চি পাতা আছে আর সেই বেঞ্চির ওপর মোটা শরীরটা এলিয়ে দিয়ে একটি মানুষ করুণ চোখে বাইরে ইস্পাতের কঠিন রেল দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে কতক্ষণে ট্রেনটা এসে পড়বে। ভদ্রলোক ডেলী প্যাসেঞ্জার। আমার মনে হয় এত দূরের একটা রেল স্টেশন থেকে এই একটি মাত্র মানুষ কলকাতায় চাকরি করতে যায়। আহা, রোজ এভাবে ছুটে এসে ট্রেন ধরা, সারাদিন শহরের একটা অফিসে কলম পিষে আবার সন্ধ্যার দিকে ছুটতে ছুটতে ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরা কত কষ্টের। বলতে কি, আমি ঐ ভদ্রলোকের নামটাও বলে দিতে পারব। কেননা আমি এখানকার মানুষ। আধা শহর আধা পাড়াগাঁ এটা। আগে হয়তো সবটাই পাড়াগাঁ ছিল। এখন শহরের ছোঁয়া ধরেছে।

পায়চারি করছিলাম, আর এই অজ্ঞাত অখ্যাত রেল স্টেশন, এখানকার আধা শহর আধা পাড়াগাঁয়ের রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি গাছ মাঠ পুকুর বনবাদাড় সব কিছু আমার চোখের সামনে ছবি হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমার চোখে জল এসে গেল।

হয়তো চিরদিনের জন্য আমি এসব ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল বলে কলকাতার গাড়িটা কখন এসে

পৌঁছবে জানতে আমার উৎসাহ ছিল না। দু-একটা মানুষ আমার মতো প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল। এক জনের হাতে ঘড়ি রয়েছে। আমি বার বার দেখতে পাচ্ছি। অথচ কাছে গিয়ে সময় জানতে আমার একটু ইচ্ছা করছিল না। তাই বলছিলাম, স্টেশন মাস্টারের ঘরের বড় দেওয়াল ঘড়িটার ছবিও আমার চোখে তখন পরিষ্কার ভাসছিল, কিন্তু দুপা এগিয়ে গিয়ে সেটা দেখে আসতে আমি কেমন ক্লান্তিবোধ করছিলাম।

একবার ইচ্ছা হল পরেশের দোকানে ফিরে যাই। পরেশ আমার বন্ধু। এই আধা শহর আধা পাড়াগাঁ অঞ্চলের একটা পাঠশালায় আমরা ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়েছি। পাঠশালার পড়া শেষ করে আমি এখানকার হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু বেচারা পরেশের ঐ পাঠশালা থেকে বেরিয়ে আর স্কুলে ভর্তি হওয়া হয়নি। তার বাবা মারা গেল। ছোট ছোট অনেকগুলো ভাই-বোন ও বিধবা মাকে নিয়ে পরেশ যে কী কষ্টে পড়েছিল। একটা মুদীর দোকানে ঢুকে পড়েছিল সে। তখন আর কত বয়স ছিল। হাফপ্যান্ট পরত, সামনের দিকের দুটো দাঁত পড়ে গিয়েছিল। আমরা স্কুলের ছুটির পর সেই মুদীর দোকানে গিয়ে ভিড় করতাম। দেখতাম আমারই বয়সী একটি ছেলে চাকরি করছে। পরেশ আমাদের দেখে প্রথম প্রথম লজ্জা পেত, তার কান দুটো লাল হয়ে যেত। চোখ তুলে সমবয়সী বন্ধুদের দিকে তাকাতে পারত না। তারপর অবশ্য অনেকদিন গেছে। পরেশ বড় হয়েছে। আমরা বড় হয়েছি। স্কুলের বেড়া ডিঙিয়ে আমি কলেজে ঢুকেছি। এখানে কলেজ নেই, নৈহাটি কলেজে আমাকে পড়তে যেতে হত, রোজ ট্রেনে চেপে যেতে হত। আর তখন দেখতাম স্টেশনের লাগোয়া ঐ ঢালু জমির উপর আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু পরেশ চমৎকার একটা চায়ের দোকান খুলে বসেছে, বেশ মোটা হয়ে গেছে পরেশ। তারপর একদিন আমি হঠাৎ কলেজের পড়া ছেড়ে দিলাম। মামা আর খরচ চালাতে রাজী

হলেন না। মামার সংসার বড় হয়ে গেছে। মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে দিতে হবে ; ছেলেরা বড় হয়েছে তাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। মামার এক বন্ধুর চেষ্টায় আমি বারাকপুরের একটি গেঞ্জির কলে চাকরি নিলাম। আমাকে রোজ ট্রেনে চাপতে হত। তাই বলছিলাম এই ছোট রেল স্টেশনের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

আর স্টেশনের লাগোয়া ঢালু জমির সেই চায়ের দোকান বারাকপুর থেকে যখন আবার ট্রেনে করে ফিরে আসতাম পরেশের দোকানের এক কাপ চা না খেয়ে বাড়ি যেতাম না। পরেশের ... কত গল্প করেছি। পরেশ লেখাপড়া শেখেনি বলে তাকে আমি অন্য চোখে দেখিনি। বারাকপুরের গেঞ্জির কলে আমার সঙ্গে কত ছেলে কাজ করত। তাদের অনেকের বিদ্যা পাঠশালা পর্যন্ত। কেউ কেউ হয়তো পাঠশালারও মুখ দেখেনি। বলতে কি তাদের সঙ্গে আমি ভাল করে মিশতে পারতাম না, সর্বদাই একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম। অন্তত মনের দিক থেকে। আর আমার মধ্যে একটা অভিমান মাথা কুটে মরত। এদের সঙ্গে আমায় কাজ করতে হত বলে। উপায় ছিল না। কলেজে ভর্তি হয়েও পড়া বন্ধ করতে হল মামার কথায়। আমি মামার সংসারে মানুষ। পাকিস্তানে ঘরবাড়ি জমিজমা ছেড়ে যখন বাবা-মার সঙ্গে চলে আসি তখন আমি এইটুকুন। মামা দেশভাগের আগে থাকতেই এখানে। বজবজের একটা জুট মিলে কাজ করে। জমিজমা বাড়িঘর কিছুই মামা করতে পারেনি। চাকরি করে এসব হয়ও না। আমরা এসে মামার সংসারে উঠেছিলাম। কিন্তু এখানে আসার এক বছরের ভিতর বাবা মা দুজনেই কলেরায় মারা যায়। সেবছর এই তল্লাটে ভীষণ কলেরা আরম্ভ হয়েছিল। আমার মামীমা ও মামীমার একটি ছেলেরও কলেরা হয়েছিল। আমার বাবা ও মার সঙ্গে আমার সেই মামাতো ভাইটি মারা যায়। আমার এক দিদি ছাড়া আর ভাইবোন নেই।

আমরা পাকিস্তানে থাকতেই দিদির বিয়ে হয়। বিয়ের পর দিদি আসামে চলে যায়। দিদির বর ডিগবয়ে একটা তেলের খনিতে চাকরি করে। এখনো তারা সেখানে আছে। এখানে এসে আমার দিদির কথা খুব মনে পড়ত। এখন আর তেমন মনে পড়ে না। বাবা-মা যখন মারা গেল তখন মামা ডিগবয়ে দিদির কাছে চিঠি দিয়ে আমাকে সেখানে পাঠানো যায় কিনা জানতে চেয়েছিল। কিন্তু মামীমা আমাকে সেখানে পাঠাতে রাজী হল না। সম্ভবত মামীমার সেই ছেলেটি, কলেরা হয়ে যেটি মারা গেল, আমার বয়সের ছিল বলে আমার ওপর মামীমার মায়া ধরে গিয়েছিল। তা ছাড়া চোখের ওপর আমার বাবা ও মাকে মাত্র আঠারো ঘণ্টার ব্যবধানে তাদের একটি মাত্র ছেলেকে চিরকালের মত অনাথ করে রেখে চোখ বুজতে দেখেছিল মামীমা। আমার জন্য তার কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। আমি মামার সংসারে থেকে গেলাম। কাজেই মামা যেদিন কলেজের পড়া বন্ধ করে দিয়ে আমাকে চাকরি করতে পাঠাল আমি আপত্তি করতে পারিনি। এক বছর চাকরি করেছি। হয়তো আরো ক'বছর করতাম। হয়তো চিরকাল, মামা যেমন আজও বজবজের মিলে কাজ করে যাচ্ছে, আমিও বারাকপুরের সেই গেঞ্জির কলে থেকে যেতাম। কিন্তু থাকা হল না। বারাকপুরের চাকরি আমি সাতদিন আগে ছেড়ে দিয়েছি।

আজ আমি কলকাতায় যাচ্ছি শুনে আমার ছোট সময়ের বন্ধু পরেশ অবাক হয়েছিল। হয়তো অবাক হত না। এখান থেকে কলকাতা খুব দূর না। রোজই এখানকার মানুষ কলকাতা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে কিছু না কিছু মানুষ এখানে আসছে। কিন্তু আমি বারাকপুরের কাজ ছেড়ে দিয়েছি, কোনদিনই আর সেখানে যাব না, এবং চিরকালের মতো এই আধা শহর আধা পাড়াগাঁ—যেখানে আমি ও পরেশ একসঙ্গে বড় হয়েছি, যে জায়গার গাছপালা রাস্তাঘাট রৌদ্র জল আকাশ বাতাস পাখির ডাক পরেশের মতো

আত্মারও প্রায় রক্তের সঙ্গে মিশে আছে হঠাৎ সেসব ছেড়ে ; এমন কি বন্ধু পরেশের ছোট দোকানটারও মায়া ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যাচ্ছি শুনে পরেশ বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। চায়ের ভাঁড়টা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে তার একটু দেরী হয়েছিল। কেন চলে যাচ্ছি পরেশ প্রশ্ন করেনি। আমি যাহোক কিছু লেখাপড়া শিখেছি। আর পাঁচটা লেখাপড়া-না-জানা মানুষের মতো সারাজীবন কিছু এখানে পড়ে থেকে এই চাকরি করে কাটাব না, ভাগ্যের অন্বেষণে জীবনকে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করে তুলতে আমি আমার পুরোনো বন্ধুদের, পুরোনো আকাশ-বাতাস জল-মাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছি ধরে নিয়ে যেন পরেশ চুপ করে ছিল। হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছিল। কিন্তু তার বেশি সে অগ্রসর হয়নি।

আমিও চুপ ছিলাম।

চুপ থেকে পরেশের হাতের তৈরী চমৎকার চা একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খেয়েছি। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়েছি। লক্ষ্য করছিলাম পরেশ আর আমার দিকে তাকাচ্ছিল না। যেন দুঃখের সঙ্গে একটু অভিমানও তার মনে দানা বাঁধতে সুরু করেছিল। আমার চোখ ছলছল করছিল। পরেশ আমায় বুঝতে পারেনি—হয়তো কোনদিন পারবে না চিন্তা করে ব্যথা পাচ্ছিলাম। কিন্তু তা হলেও কেন তাদের সকলকে ছেড়ে আমি কলকাতা ছুটছি পরেশকে বলা হল না, হয়তো কোনদিন হবে না।

আমি কি তাকে বলতে পারতাম, একটি মুখ, একটি মানুষকে ভুলতে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এই জায়গার ধুলো-মাটি জল-ঘাস পাখির ডাকের মতো একজোড়া কালো চোখের দৃষ্টি, একটি মুখের নিশ্বাস, হাসি, কথা আমার স্মৃতি শ্রুতি আমার বুকের রক্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এইজন্যই সে-মুখ ভুলে যেতে এত কষ্ট হচ্ছে। আবার ভুলে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

ট্রেন আসছে। কলকাতার ট্রেন। ঘড়ঘড় শব্দটা কানে ভেসে

এল। দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এক মিনিটের বেশি এখানে ট্রেন দাঁড়ায় না। প্ল্যাটফর্ম চঞ্চল হয়ে উঠল। যাত্রীরা সার বেঁধে লাইনের ধারে ধারে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি তাকিয়ে আছি। যেন আমি ওদের দলে নই। যেন আমি আগের দিনের মতো বেড়াতে বেড়াতে স্টেশনে এসেছি কলকাতার গাড়ি দেখতে। ট্রেন দাঁড়াবে। তাড়াহুড়ো করে যাত্রীরা ট্রেনে উঠবে। তারপর ট্রেন ছেড়ে দেবে। প্ল্যাটফর্মটা কতক্ষণের জন্য শূন্য স্তব্ধ হয়ে থাকবে, আর আমিও আস্তে আস্তে স্টেশনের চৌহদ্দী পার হয়ে পরেশের দোকানে গিয়ে হাজির হব। কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে পরেশ আমার দিকে তাকাবে, দোকানের সামনের বেঞ্চিটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, 'আয় বিনু, বোস, জয় মা কালী কেবিনের চা খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর।' পরেশের চায়ের দোকানের ঐ নাম। সাইনবোর্ডটা আমার চোখের সামনে ভাসছিল।

॥ দুই ॥

পুরো দু'ঘণ্টা সময় লাগল না, আমার চোখের সামনে থেকে নীল আকাশ সবুজ বন শ্যামল প্রান্তর অদৃশ্য হল আর কালি ধোঁয়া জন, যান ও কোলাহলে পূর্ণ প্রকাণ্ড একটা শহর আমায় গিলে ফেলল।

ঘামছিলাম, কান দুটো গরম গরম লাগছিল, স্নান করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। অবশ্য যতক্ষণ রিক্শায় বসে ছিলাম, ততক্ষণ স্নান বা চোখে মুখে কানে জল ছিটিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করার কথা চিন্তা করছিলাম। অনেক গলি ঘুঁজি ঘুরে রিক্শা যখন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের একটা পুরোনো বাড়ির সামনে আমায় নামিয়ে দিল তখন আমার মনে অন্য রকম ভাবনা উপস্থিত হল।

আমার বারাকপুরের গেঞ্জির কলের সহকর্মী পূর্ণর পরিচয়পত্র নিয়ে মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বরও পূর্ণ আমায় লিখে দিয়েছে। মানুষটির নাম সারদা রায়। পূর্ণর মামা। বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতায় চলে আসতে ছটফট করছিলাম। কিন্তু কোথায় থাকব, কার কাছে উঠব চিন্তা করে যখন কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না তখন পূর্ণ আমায় পরামর্শ দিল তার মামার সঙ্গে দেখা করতে। অনেকদিন মামা কলকাতায় আছেন। দশটা লোকের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা। তা ছাড়া বুদ্ধিমান লোক, আর মনটাও ভাল, দিল-দরিয়া মানুষ। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে আমার একটা না একটা সুবিধে করে দেবেনই।

পুরোনো বিশাল বাড়িটার গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে আমি চিন্তা করছিলাম কাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব এখানে সারদা রায় বলে কেউ থাকেন কিনা। থাকেন সন্দেহ নেই। না হলে পূর্ণ আমায় এই ঠিকানা

দিত না। কিন্তু এখন তিনি বাড়ি আছেন কিনা, আর সবচেয়ে মুশকিল হল, ঠিক কোন্ তলায় তাঁর ঘর আমি ঠিক করতে পারছিলাম না। কারণ পূর্ণ আমায় তা বলে দেয় নি। কেবল বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম লিখে দিয়েছে সে। বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম, তেতলা বাড়ি, অনেকগুলো ঘর, যেন এখানে অনেক লোকের বাস। ওপরে ওঠার সিঁড়ি কোন্ দিক দিয়ে তা-ও আমি ঠিক করতে পারছিলাম না। প্রকাণ্ড কলাপ্‌সিবল গেট। গেট খোলা আছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দুজনকে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। যেন তারা খেলার কথা বলতে বলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এতবড় একটা ঝাঁকা মাথায় নিয়ে একটা লোক ভিতরে ঢুকল। শাক-সব্‌জি এমন কি একটা বড় মাছও যেন ঝাঁকার আছে মনে হল। সম্ভবতঃ বাজার নিয়ে লোকটা ভিতরে চলে গেল। আমি নতুন করে ঘামতে সুরু করলাম। একমিনিট পার না হতে একটি মেয়েছেলেকে আমি ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। পান চিবোচ্ছে। আঙ্‌লের ডগায় চুন। খালি পা। কিন্তু পরনের কাপড়খানা বেশ ফরসা ও মাথার খোঁপাটাও বেশ টান টান করে বাঁধা। পায়ের গোড়ালীতে আলতার দাগ। যেন কবে আলতা পরেছিল। এখন ফিকে হয়ে এসেছে রং।

আমি এমন ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম যে আমাকে ও না দেখে পারল না, থমকে দাঁড়াল, পানের পিকটা ফেলে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে ঘাড় সোজা করে ও আমার চোখের দিকে তাকাল।

'আমায় কিছু বলছেন?' যেন একটু মনোযোগ দিয়ে ও আমায় দেখছিল, আমার চুল, আমার পোশাক, পায়ের চটি, হাতে ঝোলান ফাইবারের সুটকেস।

'এখানে সারদা রায় থাকেন?' আমি ওর চোখে চোখ রাখলাম। কপাল কুঁচকে ভুরু বেঁকিয়ে স্ত্রীলোকটি কি যেন চিন্তা করল, ঘাড় ঘুরিয়ে গোটা বাড়িটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল,

তারপর আমার দিকে তাকাল।

'কোন্ তলায় থাকেন তিনি? ঘরের নম্বর জানেন?'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম ও মাথা নাড়লাম।

'তবে তো বাবু আমার পক্ষে বলা শক্ত। আমি তেতলায় হরিপদ বাবুর আর দোতলার নীহারবাবুর সংসারে ঠিকে কাজ করি। এই তো বাসন মেজে ধুয়ে জল তুলে বাটনা বেটে উনুন সাজিয়ে দিয়ে এলাম—এখন যাচ্ছি কেশব সেন স্ট্রীটে কানাইবাবুর বাড়ির কাজে।' মিশিমাখা দাঁতগুলি বার করে মিষ্টি একটা হাসি আমায় উপহার দিয়ে ঝি আস্তে আস্তে একদিকে চলে গেল।

আরো কয়েক মিনিট আমি একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক সময়ে দপ্ করে রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। বুঝলাম সন্ধ্যা হয়েছে। এই শহরে সন্ধ্যা কখন কি ভাবে আসে বোঝা যায় না। রাস্তার আলো জ্বলতে টের পাওয়া যায়। এইবার আমার কেমন ভয় করতে লাগল। অপরিচিত, হ্যাঁ, আমার কাছে এখনো অপরিচিত এই কলকাতা শহর। জীবনে একবার—মাত্র একদিন এসে ছিলাম মামার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার জন্য। একটু খরচপত্র করে মামার ছোট ছেলের মুখে ভাত হয়েছিল। আর তার জন্য কিছু কেনাকাটা করতে আমরা বৈঠকখানা বাজারে চলে এসেছিলাম। বাজার সেরে সেখান থেকে আবার দুজনে শেয়ালদা স্টেশনে ফিরে গিয়ে ট্রেনে উঠেছিলাম। কলকাতার কিছুই দেখা হয়নি সেদিন। কিছুই বুঝিনি। অথচ মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত একদিন কলকাতায় বেড়িয়ে যাই। বড় হয়েছি এখন, ভয় কি। কিন্তু ইচ্ছাটা খুব বেশি জোর ধরতে পারেনি। কেননা আমার ইচ্ছা, আমার মন, আমার স্বপ্ন ও কল্পনা, একটি মানুষ, একটি মুখকে সারাক্ষণ এত বেশি ঘিরে থাকত যে অন্য সব ইচ্ছা ফিকে হয়ে যেত—গেছে। আজ অবশ্য আর সেদিন নেই। বরং দুঃখ হচ্ছিল এখানে আমি আগে কেন আসিনি। তা হলে কি আর নিজেকে এতটা অসহায় বোধ করতাম।

একটা রিক্‌শা দাঁড়াল। একটি মেয়ে নামল। ফরসা রং। হাতে ঘড়ি। চশমার ওপরে চোখের কাজলের রেখাও আমার চোখে পড়ল। প্লাস্টিকের ছোট ব্যাগ খুলে রিক্‌শাওলাকে পয়সা দিয়ে মেয়েটি একটু সময় আমাকে দেখল।

আমিও ভাল করে মুখখানা দেখলাম। টিকোলো নাক। থুতনিটা একটু ছোট। তা হলেও মুখের ডৌলটা সুন্দর। আমার মনে হল আমার চেয়ে ছোট হবে না মেয়েটি—বড়ও না, যেন আমার মতো ওরও আঠারো থেকে উনিশের মধ্যে বয়স হয়েছে।

ও একটা ছোট ঢোক গিলল।

আমিও ঢোক গিললাম।

এ এক অদ্ভুত অবস্থা!

মেয়েটি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, আমি কথা বলতে চাইছি। অথচ কারোর মুখ দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। আমরা আরো একটু সময় পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শত অপরিচয়ের মধ্যেও সমান বয়সের দুটি ছেলে মেয়ের মধ্যে হঠাৎ আন্তরিকতার আলো দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। তাই তারা পরস্পরকে অস্বীকার করতে পারে না। মেয়েটি এই বাড়িতে ঢুকছিল। কিন্তু আমাকে এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে—আমিও তাকে উপেক্ষা করতে পারছি না, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। অবশ্য এ-বাড়ির যে-কোন একটি মানুষকে আমার দরকার। আমি পূর্ণর মামার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি, ভদ্রলোকের দেখা না পেলে আমাকে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হবে।

'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

আমি তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করলাম।

'এখানে সারদাবাবু থাকেন? সারদা রায়?'

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। সেই ঝিয়ের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে ও গোটা বাড়িটার ওপর চোখ বুলাল। তারপর আমার দিকে তাকাল।

'ভদ্রলোক কি করেন ?'

'তা আমি বলতে পারব না।'

'তবে তো বলা শক্ত।' মেয়েটি অল্প হাসল। 'এ বাড়িতে অনেক মানুষ আছে। কেউ ডাক্তার, কেউ প্রফেসার—উকিল, কেরানী, আবার ব্যবসা-বাণিজ্য করে এমন মানুষও কিছু কিছু আছে। আমি অবশ্য তাদের কাউকে চিনি না, নামও জানি না—তবে, ঐ যে কি নাম বললেন, সারদা রায়, তিনি কি করেন জানলে হয়তো অনেকটা আন্দাজ করে বলতে পারতাম দোতলায় থাকেন কি তেতলায়।'

ও কি বলতে চাইছে হঠাৎ বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি।

'একতলায় কম মাইনের কেরানী প্রফেসাররা থাকেন—উকিল ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার যাঁরা তাঁরা দোতলায় থাকেন, অবশ্য তাঁদের মধ্যেও এক আধজন যে একতলায় না থাকেন এমন না, আবার এক ডাক্তার তেতলায় আছেন—খুব পসার তাঁর। যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আছেন তাঁরা প্রায় সবাই তেতলার বাসিন্দা। তাঁদের পয়সা বেশি।'

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল।

কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান হল না। পূর্ণর ওপর রাগ হচ্ছিল। ঘরের নম্বর না দিক, তার মামা কী করে আমায় সে বলে রাখতে পারত। তা হলেও ভদ্রলোককে খুঁজে বার করার একটা পথ থাকত।

'তা এক কাজ করুন না। ভেতরে চলে যান। একটু বাঁদিকে গেলে ওপরে ওঠার সিঁড়ি পাবেন। আপনি বরং আগে একতলায় দু-একটা ঘরে জিজ্ঞেস করে নেবেন—কে জানে যদি ভদ্রলোক নীচে থাকেন।'

'আপনি কি ভিতরে যাচ্ছেন এখন ?' আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম।

মেয়েটি ঘাড় কাত করল। কিন্তু সরাসরি আমার প্রশ্নের উত্তর

দিল না। আঙুলের নখ দেখল। একটা নখ রং করা। একটু পরে ও মুখ তুলল।

'আপনার সঙ্গে আমি বাড়িতে ঢুকতে চাইছি না। আপনি আগে চলে যান। আমি পরে ঢুকব।'

অপরিচিত ছেলের সঙ্গে ভিতরে যেতে আপত্তি। হয়তো সঙ্কোচ। হয়তো ওর দিক থেকে না, বাড়ির দিক থেকে আপত্তি। বা প্রতিবেশীরা কিছু মনে করে—সেই ভয়, লজ্জা। অথচ রাস্তায় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ দুজনে কথা বলেছি। তবে রাস্তা ও পাঁচিলে তফাৎ আছে বৈ কি। পাঁচিলের ওপারের জায়গা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

'আচ্ছা, আপনি চলে যান।' আমি হাসলাম। 'আমি আর একটু অপেক্ষা করব—দেখি আর কেউ যদি বাইরে আসেন,—কি কোন পুরুষ মানুষ বাড়িতে ঢুকছেন দেখি তবে না হয় তার সঙ্গে—' কথাটা শেষ করলাম না। ওর মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আর দাঁড়াল না, ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে ভিতরে চলে গেল। বুঝলাম পুরুষ কথাটা উচ্চারণ করা আমার ঠিক হয়নি। মেয়েটি আঘাত পেয়েছে। আর আমার তখন হঠাৎ খেয়াল হল, ও কোন্ তলায় থাকে জিজ্ঞেস করা হল না। আশ্চর্য! যদি পূর্ণর মামা সারদা রায়ের দেখা পেয়ে যাই এখানে তবে হয়তো আজ রাতটা আমাকে এ-বাড়িতে কাটাতে হবে। একটা আস্তানা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কাল সকালেও থেকে যেতে পারি। অথচ আমি জানব না মেয়েটি কোন্ ঘরে কোন্ তলায় আছে।

হয়তো কাল সারাদিন এখানে থাকলেও আমি ওর দেখা পাব না।

হয়তো নিজে থেকেই ও দেখা দেবে না।

নিশ্চয় আমার ওপর রাগ করেছে।

বুকের ভিতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল।

আমি অনুমান করলাম এত বড় একটা বাড়িতে কম করে হলেও

শ দেড়শ মানুষ বাস করে। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা কঠিন না। তা ছাড়া আমি তো দরজায় দরজায় ঢুঁ মেরে জিজ্ঞেস করতে পারব না ও কোন ঘরে থাকে। তবে আর পূর্ণর মামাকে খুঁজে বার করতে এত ইতস্তত করছি কেন।

গাড়িটা আমার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সি থেকে যিনি নামলেন তাঁকে রাস্তা দিতে আমি এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। কলাপসিবল গেট-এর দিকে তিনি পা বাড়ালেন। গায়ে ফিনফিনে আদ্দি। পায়ে সোয়েড। চমৎকার নাদুস-নুদুস দেহ। গোঁফজোড়াটা সুন্দর। মাথা ভর্তি কালো কোঁকড়া চুল।

তিনি হঠাৎ আমায় লক্ষ্য করলেন। দাঁড়ালেন।

'কাকে চাই ?'

'সারদাবাবুকে।' এমন কটমট করে তিনি আমাকে দেখছিলেন কেমন যেন জড়সড় হয়ে গেলাম। চোখ দুটো ছোট, কিন্তু দৃষ্টিটা ভয়ানক তীব্র—ধারালো। তাঁর গা থেকে সুন্দর একটা গন্ধ উঠে আসছিল। তেল এসেন্স পাউডার সাবান—ঠিক কিসের গন্ধ বুঝলাম না যদিও।

'আমিই সারদাবাবু—সারদা রায়।' পকেট থেকে রুমাল বার করে তিনি কপাল মুছলেন ঘাড় মুছলেন। সুন্দর গন্ধটা এখন আরো বেশি করে নাকে লাগল। বুঝলাম এসেন্সের গন্ধ। পূর্ণর মামা রুমালে অনেকটা এসেন্স ঢেলেছেন।

পকেট থেকে পূর্ণর চিঠিটা বার করে তাঁর হাতে দিতে গেলাম। কিন্তু তিনি সেটা স্পর্শও করলেন না।

'কোথা থেকে আসা হয়েছে ?'

'শ্যামনগর।' একটা ঢোক গিলে বললাম, 'আমি পূর্ণর বন্ধু। পূর্ণ পাঠিয়েছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কে পূর্ণ!' যেন আকাশ থেকে পড়লেন তিনি। 'হঠাৎ আমার কাছে কেন?'

প্রমাদ গুণলাম। পূর্ণকে তিনি চেনেন না। এত মামা মামা করে বেচারা। মামার কথা নিয়ে তার কত গর্ব। কলকাতার একটা নামকরা মানুষ সারদা রায়। আমার একটা সুবিধা করে দেবেন বলে কত উৎসাহ নিয়ে সে চিঠি দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

রুমালটা আবার কপালে ঘসতে ঘসতে তিনি গেট-এর দিকে সরে যাচ্ছিলেন।

পর পর দুটো ঢোক গিলে গলাটা পরিষ্কার করে নিলাম।

'আপনার ভাগ্নে পূর্ণ নন্দী। পূর্ণর বাবার নাম আনন্দ নন্দী। পূর্ণর সঙ্গে আমি বারাকপুরের দি গেঞ্জেস হোসিয়ারী মিলে কাজ করতাম। পূর্ণর চিঠি নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কথাগুলো তিনি শুনলেন। কিছু বললেন না। এবার একটু আশ্বস্ত হওয়া গেল। বিশাল গেট পার হয়ে তিনি ভিতরে ঢুকলেন। আমি তাঁর পিছে পিছে হাঁটছি। আপত্তি করছেন না দেখে আর একটু আশা হল।

'আপনার অনেক কিছুতে হাত আছে—অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা। পূর্ণ বলছিল আপনি একটু চেষ্টা করলেই আমার একটা সুবিধা হয়ে যেতে পারে।'

'তার মানে চাকরি!' স্বরটা বিকৃত করে ফেললেন সারদা রায়। 'গাছের ফল। নাড়া দিলেই টুপ করে পড়বে, কেমন!'

আমি নীরব।

একতলার চৌহদ্দী ডিঙ্গিয়ে আমরা দোতলায় উঠে গেলাম। এতক্ষণ নানা রকম শব্দ কানে আসছিল, নানা রকম রান্নার গন্ধ নাকে আসছিল। একটা ঘরে রেডিও বাজছিল, আর এক ঘরে কে যেন কাঁদছিল। মনে হল কোন স্ত্রীলোক কাঁদছিল। বাজখাঁই গলায় পুরুষ চিৎকার করছিল। হয়তো স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। কোন ঘরে

একটা বুড়ো ভীষণ কাশছিল—পচা চিংড়ি মাছের গন্ধ পেয়েছিলাম, পুঁইশাকের গন্ধ পেয়েছিলাম, একটু নর্দমার গন্ধও নাকে লেগেছিল। দোতলায় উঠে মনে হল শব্দ-টব্দ কম, রান্নার গন্ধও তেমন চড়া হয়ে নাকে লাগছিল না। যেন কোন ঘরে মাংস সিদ্ধ হচ্ছিল। মোলায়েম মিষ্ট গন্ধটা টের পেলাম। এরা অপেক্ষাকৃত বিত্তবান। সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ল। বলতে কি, একতলার কোন ঘরের দিকে আমি তাকাইনি, দোতলায় উঠে বার দুই এদিক ওদিক তাকালাম। যদি ওর দেখা পাওয়া যায়।

'ভাগ্নের শরীর ভাল আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ!' বুঝলাম মামার মেজাজ ফিরে এসেছে। খিট-খিটে ভাবটা চলে গেছে। 'পূর্ণ—তার ভাই-বোন, বাবা-মা সবাই ভাল আছে।' কথার শেষে আমি একটু হাসলাম। কিন্তু আমার হাসি তিনি দেখলেন না। তবু যাহোক পূর্ণকে এতক্ষণ পর মনে পড়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। পূর্ণকে মনে রাখলে তিনি আমাকেও মনে রাখবেন—আমার জন্য কিছু করবেন। আর যদি পূর্ণকেই তিনি ভুলে গিয়ে থাকেন তো পূর্ণর চিঠি বা পরিচয় নিয়ে এসে এখানে কোন কাজ হবে না। আর সেই ভয়ে আমি এতক্ষণ সারা হয়ে যাচ্ছিলাম।

দোতলা নীচে রেখে আমরা আবার সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগলাম। মনে মনে খুশি হলাম। পূর্ণ তাহলে ঠিকই বলেছিল। তার মামা কলকাতা শহরে দশজনের একজন। এই মানুষ তেতলায় থাকবে না তো কে থাকবে! যথেষ্ট নামডাক আছে তাঁর। যথেষ্ট পয়সা আছে। পয়সা না থাকলে এদিনে কে কাকে মনে করে, কে কার নাম জানে।

'কতক্ষণ আসা হয়েছে?'

'পাঁচটার ট্রেনে।'

'আর ঠায় দু'ঘণ্টা গেট-এর সামনে দাঁড়িয়ে বুঝি?'

আমি সলজ্জভাবে ঘাড় কাত করলাম। এবার তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। ছোট চোখ দুটিকে এখন আর তেমন ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। যেন দুই চোখে বেশ একটু দয়া-মায়া আছে। পূর্ণর কথা মনে পড়ল। এম্নিতে রাগী—আসলে মামার মনটা ভাল। যদি একবার তোকে মনে ধরে যায় তো আর তোকে পায় কে।

একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। দরজায় তালা ঝুলছে।

আমার মনে হয় তেতলাটা আরো বেশি নীরব। এখানে কোন শব্দ বা গন্ধ নেই। আর, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, সব কটা ঘরের দোর ভেজানো। যেন এখানে মানুষ পা টিপে টিপে চলাফেরা করছে, ফিসফিস করে কথা বলছে। হয়তো কথাই বলছে না। কে কি রান্না করছে কে কি খাচ্ছে এইখানে সেটি বোঝা শক্ত। কে মন খারাপ করে বসে আছে, কে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছে বাইরে থেকে বলা কঠিন। মুখ না দেখলে বোঝা যাবে না। কিন্তু মুখ দেখতে কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে নেই। সব যে যার ঘরে। একতলার সিঁড়ি বারান্দায় মানুষ গিস্‌গিস্‌ করছে, দোতলার বারান্দায় তেমন করে মানুষ হাঁটা-চলা না করলেও কিছু কিছু মুখ দেখতে পাওয়া গেছে বৈ কি—এখানে এত বড় বারান্দা—এই দেওয়াল থেকে সেই দেওয়াল পর্যন্ত মরুভূমির মতো কেমন শূন্য স্তব্ধ হয়ে আছে।

মামা পকেট থেকে চাবির গোছা বার করলেন।

'এই ঘর!' কেমন বোকার মতো প্রশ্ন করলাম।

মামা হাসলেন।

'তা না হলে দরজায় তালা খুলতে যাব কেন হাঁদারাম।' ঠিক ধমক না। আদরের বকুনি। সারদা রায়ের এই বকুনি আমার ভাল লেগেছিল। তালা খুলে তিনি ভিতরে ঢুকলেন। আমি পরে ঢুকেছিলাম।

॥ তিন ॥

সারদা রায়ের রুচি আছে। এমন সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন ঘরখানা। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। খাট, পরিচ্ছন্ন বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, সোফা, সেটি, জানালার পর্দা, টেবিলের ফুল, কাচ সরানো আলমারির ভিতর সাজানো নানা রকমের পুতুল—তাকিয়ে তাকিয়ে আমি সব দেখছিলাম। তার ওপর আলোটা সুন্দর। এমন চমৎকার আলোর ডুম থাকতে পারে আমার ধারণায় ছিল না। এখন তাঁর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। ওধারে ব্র্যাকেটে শার্ট প্যাণ্ট টাই ঝুলছে। তার মানে সাহেবী পোশাক পরেও তিনি বেরোন। রোজই পরে বেরোন কিনা চিন্তা করলাম। একদিকের দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। বেশ বড় ক্যালেণ্ডার। তারিখগুলো ছোট। ছবিটাই বড়। একটি মেয়ে জলে নেমে স্নান করছে। কোমর পর্যন্ত জল। আঠারো-উনিশের বেশি বয়স হবে না। খালি গা হয়ে স্নান করছে। যেন একটু বেশি সময় আমি ওদিকে তাকিয়ে ছিলাম। চমকে উঠলাম। সারদা রায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ঠোঁট টিপে হাসছেন। কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠলো তিনি যে এত সকাল সকাল বাথরুম থেকে ফিরে আসবেন কে জানত।

'কেমন, চমৎকার না মেয়েটা দেখতে।'

আমি তাঁর দিকে একবার চেয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিলাম। এবার ঠোঁট ছড়িয়ে তিনি হাসছেন। যেন আরো বেশি লজ্জা পেলাম। আঙ্গুলের নখ খুঁটতে লাগলাম।

'আমার যখনই মন খারাপ হয় ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।' ড্রেসিং টেবিলটার কাছে সরে গিয়ে তিনি চুল আচড়াতে লাগলেন। আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছেন বলে সাহস করে মানুষটাকে ভাল

গায়ে ছিল বলে নাদুস নুদুস লাগছিল। স্নান করে এসেছেন। এবার আমি তাঁকে খালি গায়ে দেখলাম। চমৎকার আঁটসাট গড়ন। যেন এককালে ডন-কসরৎ করতেন। কাঁধ ও হাতের মাংসের গুলি এখনো ফুলে ফুলে উঠছে। মাথায় চিরুনি চালাচ্ছিলেন। জায়গায় জায়গায় পিঠের মাংসের চাকা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'কি হল, দাঁড়িয়ে কেন? হাত-মুখ ধোয়ার কাজটা সেরে এলে হত না! না কি রাত্রে চান করার অভ্যাস আছে?' আমার দিকে তিনি তাকান না। নিজের চুল নিয়ে ব্যস্ত। আয়নার দিকে মুখ করে কথা বলছিলেন। সত্যি এমন কালো কোঁকড়া চুল আমি অনেকদিন দেখিনি। আমার মনে হল অনেকক্ষণ ধরে তিনি চুল আচড়াবেন। 'বাথরুমে সাবান তেল সব আছে। খবরদার আমার তোয়ালে ব্যবহার করা চলবে না।' আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে তিনি যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিলেন। 'উঁহু—তোয়ালে আর বিছানা—আমার বিছানাও আমি কাউকে ব্যবহার করতে দিই না।'

কথাগুলো শুনছিলাম আর মানুষটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। পূর্ণর মামা যে সুপুরুষ একবাক্যে তা সবাই স্বীকার করবে। কত বয়স হবে? ত্রিশ পার হয়েছে অনুমান করলাম। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশও হতে পারে। যেন বয়সের কথা ভাবতে ভাবতে খচ্ করে আমার আর একটা কথা মনে পড়ল। সারদা রায় কি আজও বিয়ে করেনি। তাই তো দেখছিলাম। সিঙ্গল খাট বিছানা। ঘরের চেহারাই বলে দিচ্ছিল মানুষটা এখানে একলা আছেন। বেশ আরামের জীবন। নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। হয়তো মেয়ে মানুষের ধার ধারে না। হয়তো দেওয়ালে টাঙানো ঐ ক্যালেণ্ডারের ছবিটাই তার জীবনের একমাত্র মেয়ে। তাই ঘটা করে ওখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এমনভাবে রাখা হয়েছে যে বিছানায় শুয়ে থেকে ছবিটা চোখে পড়বে। ওদিকের ওই

সোফায় বসলেও চোখে পড়বে। টেবিলের কাছে দাঁড়ালেও চোখে না পড়ে উপায় নেই। মন খারাপ হলে সারদা রায় মেয়েটিকে দেখেন। ল্যাংটা হয়ে স্নান করছে। আমার মনে হচ্ছিল মন খারাপ না থাকলেও তিনি ওটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। যতক্ষণ এই ঘরে কেউ আছে এমন একটা আশ্চর্য স্নানের ছবির দিকে তাকে মিনিটে মিনিটে তাকাতে হবে। ঘুমিয়ে পড়লে অবশ্য আলাদা কথা। তা না হলে—

'কি হল।' চিরুনি রেখে দিয়ে সারদা রায় ঘুরে দাঁড়ান। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সুটকেশ খুলে লুঙ্গি গামছা বার করলাম। এখানকার এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে ময়লা লুঙ্গি গামছা বার করতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। তা ছাড়া আমার পরনের জামা-কাপড়ই বা এমন কি ধোপদুরস্ত ছিল। সারদা রায় বুঝে গেছেন আমার কি অবস্থা চলছে।

অবস্থা খারাপ না হলে তাঁর কাছে আমি প্রার্থী হয়ে বা ছুটে আসব কেন। তিনি আমায় কৃপার চোখে দেখবেন স্বাভাবিক।

'হুঁ চটপট সেরে নাও।' আমার ময়লা লুঙ্গি গামছা গেঞ্জি দেখে সারদা রায়ের নাকের ডগা বা ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল না কিন্তু। বরং তার মেজাজটা যেন আগের চেয়েও বেশি খুলে গেছে। গুণ গুণ করে গান গাইছেন। স্নান করে গা মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে বলে মনটা ফুর্তিতে ভরে আছে হয়তো। টিন উপুড় করে তিনি বুকে পিঠে পাউডার ছড়াতে লাগলেন। টাটকা ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস নতুন করে ম ম করতে লাগল। হাস্নাহানা ফুলের গন্ধটা হুবহু নকল করছে পাউডার কোম্পানি।

'বাঁয়ে বাঁয়ে—বাঁ দিকে।' লুঙ্গি গামছা হাতে পিছনের দরজা পার হয়ে ছোট প্যাসেজে আমি পা বাড়িয়েছি কি তিনি পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সুইচ টিপে দাও।'

আলো জ্বলতে বাথরুমের সবুজ দরজাটা আমার চোখে পড়ল। তাঁর শোবার ঘর কেমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন। বাথরুমও সুন্দর হবে পরিচ্ছন্ন হবে জানা কথা। অনেকক্ষণ লাগিয়ে স্নান করলাম। তাঁর তোয়ালে ব্যবহার করলাম না। কিন্তু গোলাপী সাবানটা অনেকটা ক্ষয় করে ফেললাম গায়ে মাথায়ে ঘসে। যাতে একটু ময়লা না থাকে। ময়লা তিনি পছন্দ করেন না। যদি আমায় তাঁর প্রিয়পাত্র হতে হয় তাঁর মতো আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে বৈ কি। মনে মনে ঠিক করলাম, কাল সাবান দিয়ে আমার জামা-কাপড়গুলো ভাল করে কেচে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলাম তাঁর পোশাক পরা হয়ে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধছেন। সাহেবী পোশাকে তাঁর আর এক রূপ খুলেছে। দেওয়ালের ব্র্যাকেটে যে শার্ট প্যাণ্ট ঝুলছে সে সব তিনি পরেন নি। মনে হল বাক্স থেকে বার করে নেওয়া হয়েছে। এইমাত্র পাট ভাঙ্গা হয়েছে। শার্টের কলারের কড়া ইস্ত্রি ও প্যাণ্টের ক্রীজ চোখে পড়ল। কাগজের মতন ধবধবে সাদা জামার সঙ্গে তিনি লাল টকটকে টাই পরেছেন। পেণ্টুলনটা ছাই রঙের। ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে যে জুতোটা পরেছিলেন সেটা নেই। অন্য এক জোড়া জুতো পায়ের কাছে। এখন চটি পরে আছেন। টাই বাঁধা হয়ে গেলে জুতো মোজা পরবেন বোঝা গেল।

'হল ?'

'হ্যাঁ।'

আয়নার দিকে মুখ করে তিনি কথা বললেন। সম্ভবত আয়নার ভিতর দিয়ে তিনি আমায় ঘরে ঢুকতে দেখেছেন।

'আমায় এখুনি বেরোতে হবে—'

আমি চুপ করে রইলাম।

'হয়তো রাত্রে আর ফেরা হবে না। বলা যায় না।'

এবারও আমি নীরব রইলাম।

যেন আমি হাসছি কি কাঁদছি দেখতে তাঁর কৌতূহল হল। আয়নার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'এই যে চিরুনি।' হাত বাড়িয়ে চিরুনি দেন আমাকে। 'একটু কেতাদুরস্ত হয়ে চলতে হবে—না হলে এখানে চাকরি বাকরি জোটানো শক্ত হবে। এর নাম কলকাতা।'

চিরুনি চালিয়ে আমি চুল পাট করতে লেগে গেলাম। আমার চুল খাড়া খাড়া। রংটাও লালচে। সম্ভবত এটা তাঁর চোখে খারাপ লাগছিল। স্বাভাবিক। তাঁর চুল কত সুন্দর—কেমন চক-চকে কালো।

'পয়সা-কড়ি কিছু আছে সঙ্গে—না কি ব্যোম ভোলানাথ হয়ে শেয়ালদা স্টেশনে নামা হয়েছে?'

পুরো মাসের মাইনে পাইনি। আগেই কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তবু যা পেয়েছিলাম তার থেকে একটা শার্ট তৈরী করতে ও এক জোড়া চটি কিনতে বারো তেরো টাকা বেরিয়ে গেছে। পরেশের দোকানে তিন টাকার মতন ধার জমেছিল। সেটা পরিষ্কার করে এসেছি। আর আসার সময় মামার ছোট মেয়েটিকে দেড় টাকা খরচ করে একটা জামা দিনে দিয়ে এসেছি। অনেক দিন মামার খেয়েছি। যখন চলে আসি মামীমার চোখ দুটো ছলছল করছিল। ছোট মেয়েটাও আমার জন্য কাঁদছিল। সকলকে দেওয়া আমার অসাধ্য ছিল। তাই ওই বাচ্চাটাকে জামা কিনে দিয়ে এসেছি। হয়তো আর কোনোদিন সেখানে ফিরে যাব না। হয়তো চিরদিনের মতো আমি শ্যামনগর ছেড়ে চলে এলাম। পরেশকে অবশ্য তা বলিনি। তা হলে তাকে কারণ বলতে হয়। সেইজন্যই চুপ করেছিলাম। অবশ্য মামা-মামীমা টের পেয়ে গেছে। আমি আর সেখানে মুখ দেখাতে যাব না। যাওয়া সম্ভব না।

হ্যাঁ, ট্রেনভাড়া এক টাকা তেরো নয়া পয়সা আর সাত আনা রিকশা ভাড়া দিয়ে গোটা আটেক টাকা আমার হাতে অবশিষ্ট

আছে। আট টাকা আর সতেরো নয়া পয়সা।

সারদাবাবুকে তাই বলব কিনা ইতস্তত করছিলাম।

'কি হল!' চটি ছেড়ে তিনি জুতো পরতে আরম্ভ করেন। এবার কিন্তু তিনি মুখটা বিকৃত করে ফেললেন। 'এমন গরুর মতন এই বাজারে কেবল মুখ বুজে থাকলে ঐ গরুর মতন শুধু ঘাস খেয়েই বাঁচতে হবে আমি আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। উঁহু— মুখে খৈ ফুটবে। চোখে মুখে কথা বলতে না পারলে ধেধ্বেড়ে গোবিন্দপুর—ঐ শ্যামনগরে ফিরে যেতে হবে।'

'আছে, সামান্য কিছু আছে।' অল্প হেসে চেহারাটাকে একটু চালাক চতুর করে তুলতে আমি তখন থেকে চেষ্টা আরম্ভ করে-ছিলাম। গেঞ্জেস হোসিয়ারি আমায় ক'টাকা দিয়ে বিদায় করেছে এবং তার থেকে এ-পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়ে হাতে কত আছে তার হিসাব দিতে যেন আমি সাহস করে পূর্ণর মামার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু দেখলাম তিনি চট করে চোখটা নামিয়ে নিলেন। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করলেন। দমে গেলাম। বুঝলাম আমার পঁচিশ টাকার হিসাব শুনতে তাঁর সময় ও ধৈর্য কোনটাই নেই। অথবা ধরে নিয়েছেন কোনমতে ট্রেনভাড়া জুটিয়ে আমি এখানে তাঁর কাছে ছুটে এসেছি। আশ্রয় চাইছি, খাদ্য চাইছি, চাকরি চাইছি। অবশ্য তাঁর পক্ষে এটা ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক না এবং কথাটা এক দিক থেকে খুবই সত্য। আট টাকায় আমার ক'দিন চলবে। তাই হঠাৎ তাঁকে চুপ হয়ে যেতে দেখে মন খারাপ করলাম না।

'এই যে—' পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলে এক টাকার একটা নোট তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দেন। 'নীচে হোটেল আছে। গেট থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে একটু হেঁটে গেলে একটা লেটার-বক্স চোখে পড়বে। লাল বাক্স। যেখানে লোকে চিঠি ফেলে, বুঝলে। ঐ লেটার বক্স-এর উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে হোটেল—এতবড়

সাইনবোর্ড রয়েছে ঃ হোটেল ডিল্যুক্স। নামটা ইংরেজী—খানাটা বাংলা। ভয় পাবার কিছু নেই। ডাল চচ্চড়ি আর মাছের ঝোল খেতে দেয়। মাছ খেলে বারো আনা লাগবে। ডাল চচ্চড়ি আর ধোকার ডালনা খেলে আট আনায় সারা যায়। ডিম খেলেও বারো আনা। মাংস খেলে পাঁচসিকা। আজ মাংস নেই। মঙ্গলবার। মিটলেস ডে।' তিনি উঠে দাঁড়ান। ড্রেসিং-টেবিলের কাছে সরে গিয়ে নতুন ভাঁজ করা রুমালে বেশ খানিকটা এসেন্স ঢেলে নেন। টাটকা যুঁইয়ের গন্ধে ঘরের বাতাস মাতাল হয়ে উঠল।

'এই যে চাবি। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। হোটেলে খেতে যাবার সময় দরজায় তালা দিয়ে যাবে। খেয়ে এসে আলো নিবিয়ে ওখানটায় শুয়ে পড়বে।' আঙুল দিয়ে তিনি ঘরের মেঝের একটা নির্দিষ্ট অংশ দেখিয়ে দেন। 'ওই যে রাগটা আলনায় ঝুলছে, ওটা বিছিয়ে নিলে চমৎকার বিছানা হবে। না মশা নেই। মশারী আমিও খাটাই না। সঙ্গে একটা কম্বল বালিশ নিয়ে এলে অসুবিধা ছিল কি। না কি তা-ও নেই?'

আমার বিছানা ছিল। কিন্তু আনিনি। কি জানি যদি আশ্রয় না জোটে তো খামকা অতিরিক্ত একটা বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে ভয়ে ওটা রেখে এসেছি। এখন সেটা আমার মামাতো ভাইদের কেউ ব্যবহার করবে। আর বিছানার যা অবস্থা! তবু যা-হোক জামা-কাপড় পরে এখানে ঢুকতে পেরেছি। সঙ্গে ঐ ছেঁড়া নোংরা বাণ্ডিলটা দেখলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ঘরে ঢুকতে দিতেন না। ভাবলাম। আবার পরক্ষণে আমার মনে হল তাঁর ওপর আমি অবিচার করছি। যদি এর চেয়েও দীন-দরিদ্র নিঃস্বের বেশে এখানে আসতাম আর তাঁর সাহায্য চাইতাম নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ঘরে তুলে নিতেন।

মনটা ভাল। পূর্ণর কথাটা আবার মনে পড়ল। কথাবার্তা

রুক্ষ হলেও মানুষটার অন্তর ভাল। চাবি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গটগট করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

অত্যন্ত বাবু বিলাসী, অতিশয় বুদ্ধিমান। আমার মনে হল তিনি যথেষ্ট দয়াবানও। যা এ যুগে বড় একটা আশা করা যায় না। কেন জানি আমার মনে হচ্ছিল যদি পূর্ণর চিঠি বা তার পরিচয় না নিয়েও আমি এখানে আসতাম আর তাঁর আশ্রয় চাইতাম তো তিনি আমাকে আশ্রয় দিতেন। এখন পর্যন্ত ভাল করে আমার পরিচয় নেননি। বারাকপুরের কাজটা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি কেন তাও জিজ্ঞেস করেননি। সঙ্গে টাকাকড়ি কি আছে না আছে জানতে তাঁর আগ্রহ হল না। হোটেলে ভাত খেতে একটা টাকা বার করে দিলেন। আর, ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, এই ঘর এত জিনিসপত্র বিশ্বাস করে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি দিব্যি বেরিয়ে যেতে পারলেন। এক ঘণ্টারও কম তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা। তাতেই এত বিশ্বাস!

কেমন হেঁয়ালির মতো ঠেকছিল মানুষটার চরিত্র। অবশ্য তখন ঠেকেছিল, পরে বুঝেছিলাম, একজনকে বিশ্বাস করতে তিনি অনেকদিন ধরে ছটফট করছিলেন। আমি এসে যাওয়াতে তিনি শান্তি পেয়েছিলেন। জানি না কেন তিনি আমাকেই বিশ্বাস করতে পারলেন। হয়তো আমার চোখ দেখে বুঝেছিলেন আমি তাঁর বিশ্বাসের পাত্র। আর বুদ্ধিমান তিনি। মানুষের চোখ দেখে তার মন বুঝতে পারার ক্ষমতা তাঁর ছিল। আমি তাঁর বিশ্বাস রেখেছিলাম বৈ কি।

ডি ল্যুক্স হোটেল খুঁজে পেতে কষ্ট হল না।

কিন্তু খেতে বসে আমার হাসি পাচ্ছিল, তিনি আমায় তখন লেটার বক্স চেনাতে কেমন উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। লেটার বক্স যে সুদুর পাড়াগাঁয়েও আছে তিনি হয়তো জানেন না। কে জানে তিনি হয়তো পাড়াগাঁ দেখেননি। হয়তো এই শহরে চিরকাল আছেন।

প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল।

কেবল ডাল ভাত চচ্চড়ি না, মাছও খেলাম। এক টুকরো খেয়ে তৃপ্তি হল না। আর এক টুকরো নিলাম। সর্ষে বাটা দিয়ে মাছের ঝাল। রান্নাটাও ভাল হয়েছিল। পুরো একটা টাকা খরচ করে ভাত খেয়ে ঘরে ফিরে এলাম। একটা টাকা খরচ হয়ে গেল বলে আমার কিন্তু একটুও অনুতাপ হল না। কেন জানি মনে হচ্ছিল, সারদা রায় জানতে পেলে সুখী হবেন। তাঁর সম্বন্ধে এমন মনোহর ধারণা প্রথম রাত থেকে আমার জন্মে গেল। যেন এর পিছনে তেমন কোন অকাট্য যুক্তি ছিল না। যেন তাঁর চোখ দেখে আমি বুঝে গিয়েছিলাম তিনি আমায় প্রথম দর্শনে ভালবেসে ফেলেছেন।

॥ চার ॥

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখলাম তিনি তখনো ফেরেননি। রাগটা গুটিয়ে ভাঁজ করে আলনায় ঝুলিয়ে রাখলাম। যেমনটি ছিল। কেননা নিজে তিনি জিনিসপত্র এমন সুন্দর করে গুছিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন যে দিনের আলোয় আর একবার ঘরের ভিতরের চেহারা দেখে আমার রীতিমত ভয় করতে লাগল। কোন জিনিস না এদিক সেদিক হয়ে আছে। তা হলে তিনি রাগ করবেন। অসন্তুষ্ট হবেন। বাথরুম থেকে চোখ মুখ ধুয়ে এসে বেশ করে চিরুনি চালিয়ে মাথাটা আবার ঠিক করে ফেললাম। আমার লালচে রুক্ষ চুল চিরুনির দাঁতে আটকে আছে কিনা তাও পরীক্ষা করলাম। চিরুনিটা পরিষ্কার করে জায়গা মতন রেখে দিলাম। তাঁর টেবিলের টাইমপীস টিক টিক শব্দ করছে। সাতটা বেজে গেছে। সাতটা দশ। একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দীর্ঘ পরিচ্ছন্ন টানা বারান্দা। শূন্য স্তব্ধ। একটি মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে বসে নেই। বুঝলাম এই মহলে বারান্দায় দাঁড়ানো রেলিং ঝুকে দাঁড়ানো অসভ্যতার সামিল। আমি পা টিপে টিপে রেলিং-এর কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দোতলাটা দেখলাম। যা ভেবেছিলাম। সেখানে বারান্দায় বসে কেউ চা খাচ্ছে খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ বা কোমরে হাত রেখে রাস্তা দেখছে। আর একটু সামনের দিকে ঝুঁকতে একতলার বারান্দার সিকি অংশ চোখে পড়ল। ওইটুকু যথেষ্ট। গিজগিজ করছে সেখানে মানুষ। যেন কে একজন বাজারের থলে হাতে বাজার করে ফিরেছে। আর দশটা মানুষ তাকে ছেঁকে ধরে কী মাছ আনল, কত করে সের নিলে, নতুন পটল বেরিয়েছে কিনা ইত্যাদি শত প্রশ্নের গুঞ্জন তুলেছে। কাদের একটা বাচ্চা মুড়ির মোয়া খাচ্ছিল। একটা কাক বুঝি অনেকক্ষণ

ধরে তাক করছিল। হুস করে এক সময় বাচ্চাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মোয়াটা তুলে নিয়ে গেল। শিশু আর্তনাদ করে উঠল। শিশুর কান্না শুনে একতলার আরো দশটা ঘরের ছেলে বুড়ো-বুড়ি যুবতী বারান্দায় ছুটে এল। বারান্দায় মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। আমি বিরক্ত হয়ে মুখটা রেলিং-এর এপারে নিয়ে এলাম।

'কি দেখা হচ্ছিল ?'

চমকে উঠলাম। সারদা রায় সামনে দাঁড়িয়ে। মিটি-মিটি হাসছেন।

'মেয়ে দেখা হচ্ছিল নাকি ?' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন।

আমি চুপ। কী উত্তর দেব। ভয়ে আমার বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করছিল। বস্তুতঃ এভাবে রেলিংএ ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকাটা অসভ্যতা। কাক দেখছিলাম, বাচ্চা ছেলের হাত থেকে দস্যু কাকের মোয়া কেড়ে নেওয়া দেখছিলাম ইত্যাদি অনেক কিছু আমার বলার ছিল। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। কেননা সেই সঙ্গে আমি আরো অনেক কিছু দেখছিলাম, কাল রাত্রের সেই ঘড়ি-পরা মেয়েটিকেও যে মনে মনে খুঁজছিলাম একথাও সত্য। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। আঙুলের নখ খুঁটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

অথচ তিনি হাসছিলেন।

কিন্তু তাতে আমার ভিতরের অপরাধ বোধ হয় স্খালন হল না। বরং মনে হচ্ছিল, তাঁর ওই হাসিটাই ঘৃণা ভৎর্সনা বিরক্তি ক্রোধ।

'চা খাওয়া হয়েছে ?'

'না।'

'চা খাওয়া অভ্যাস নেই ?'

তিনি এমনভাবে চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন যে বাধ্য হয়ে আমাকে চোখ তুলে তাকাতে হল। দেখলাম তখনো তাঁর মুখে

হাসি লেগে আছে। এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম। দ্বিতীয়বার তাঁকে ভুল ভাবতে যাচ্ছিলাম। তাঁর হাসি হাসিই। তিনি যখন হাসেন তখন তাতে ঘৃণা ভর্ৎসনা ক্রোধ বিদ্বেষ থাকে না। কুটিল হাসি হাসবার প্রকৃতি তাঁর নয়। বন্ধুর মতো হেসে তিনি আমায় ঐ প্রশ্নটা করছেন। বন্ধু যেমন বন্ধুর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। অবাক হলাম আঠারো বছরের ছেলের সঙ্গে তাঁর বয়সের মানুষ বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছেন কি?

'বারোয়ারী বাড়ি—অনেক মেয়ে আছে। দেখবার ঢের সময় হবে। এই বেলা চট করে চা-টা খেয়ে এসো তো নীচে থেকে।' মনিব্যাগ খুলে তিনি একটা আধুলি আমার দিকে বাড়িয়ে দেন। 'গেট থেকে বেরিয়ে ডাইনে কয়েক পা এগিয়ে গেলে একটা লণ্ড্রি চোখে পড়বে। লণ্ড্রি চেন তো—কাপড় ধোলাইর দোকান। লণ্ড্রি চিনে রাখতে হবে। আমাদের ময়লা জামা-কাপড় ওখানে যাবে। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড রয়েছে। বাঙ্গালীর দোকান। তা হলেও নামটা ইংরেজী। হোয়াইট ওয়াশ্। কেমন নামটা চমৎকার না?'

এবার আমি হাসলাম। তিনি আর হাসলেন না।

'ঐ লণ্ড্রির গায়েই চায়ের দোকান। সাকুরা। ওটা কিন্তু জাপানী নাম। আসলে বাঙ্গালীর দোকান। ভদ্রলোকের নাম সাধন কুমার রাহা। সংক্ষেপে সাকুরা হয়েছে।'

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাঁর মুখ দেখছিলাম।

কেন না তিনিও হঠাৎ গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার মুখ ও মাথাটা দেখছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ আমার মাথার দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি ফের মানিব্যাগের মুখ ফাঁক করে আর একটা আধুলি তুললেন। 'চা খেয়ে সেলুনে চলে যাবে। সেলুন নাপিতের দোকান। সাকুরার ঠিক উল্টোদিকের ফুটপাথে। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড রয়েছে। অলকা সেলুন। চুল দাড়ি আট আনা নেবে। না, ঐ

খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর বাউলের মতো লম্বা চুল এ-শহরে অচল। চাকরি পাওয়া যায় না, মেয়ের মন পাওয়া যায় না, ট্রামে বাসে জায়গা থাকলেও কেউ পাশে বসতে দেয় না। যাও চট করে দুটো কাজ সেরে এসো।'

তিনি গটগট করে ঘরে ঢুকলেন।

আধুলি দুটো পকেটে ফেলে আমি নীচে নেমে গেলাম।

সাড়ে নটা বেজে গেল আমার ফিরে আসতে। তাঁর দাঁড়ি কামানো স্নান ইত্যাদি হয়ে গেছে। আমি ঘরে ঢুকতে তিনি আবার মনোযোগ দিয়ে আমার মাথা মুখ দেখলেন। এবার খুশি হলেন।

'চট করে স্নানটা সেরে নাও। আমরা দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব।' বুকে গলায় তিনি পাউডার ছড়াতে ব্যস্ত ছিলেন। 'ওয়ান মিনিট।' আমি বাথরুমের দিকে যাচ্ছিলাম। তিনি বাধা দিলেন।

'তোমার নামটা কিন্তু এখনো জানা হল না।'

'বিনয়—বিনয় চট্টোপাধ্যায়।'

'আমি কি চ্যাটার্জি বলে ডাকব।' তিনি হঠাৎ চোখ বুজলেন। যেন কি চিন্তা করলেন। 'নাঃ—বিনয়—শুধু বিনয় ভাল।' আবার তিনি চোখ বুজলেন। মনে মনে মন্ত্র পড়ার মতন ঠোঁট দুটো কয়েকবার নাড়লেন। 'না—তার চেয়ে ভাল বিনু—বেশ মেয়েলি গন্ধ আছে নামটায়—কেমন না।'

আমি ঠোঁট টিপে হাসলাম। তিনি হাসলেন না।

'আর আমায় তুমি কি ডাকবে? সারদাবাবু?'

'কেন, মামা—পূর্ণর বন্ধু আমি—কাজেই—'

'না, ওসব চলবে না। মামা-ভাগ্নে খুড়ো-ভাইপো সম্পর্ক পাড়াগাঁয়ে চলে। এখানে না। কলকাতায় না। কসমোপলিটন শহর। পাঁচজনের সামনে মামা ডাকলে তিনজনই বুঝবে না আমায় ডাকছ কি গালি-গালাজ করছ।'

'তবে রায়বাবু বলে ডাকব।'

'ধ্যেৎ। তিনি ভুরু কুঁচকোলেন।'

'টালা থেকে টালিগঞ্জ শেয়ালদা থেকে শালকে সবাই মিঃ রায় বলে ডাকে। তুমিও ডাকবে।'

আমি ঘাড় কাত করলাম।

'চট করে বাথরুমের কাজ সেরে এসো।'

আমি সেদিকে পা বাড়াচ্ছিলাম। আবার তিনি বাধা দিলেন। 'ওয়ান মিনিট।' ঘুরে দাঁড়াই।

'লেখাপড়া কদ্দুর?'

'স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে এক বছর কলেজে পড়েছিলাম।'

'বটে!' তাঁর হাতের পাউডারের টিন স্থির হয়ে যায়। 'আমার চেয়ে বিদ্বান। আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারিনি। আমাদের সময় ম্যাট্রিকুলেশন ছিল।'

'তা জানি।'

হঠাৎ চুপ থেকে তিনি পাউডারের টিনের গায়ের সুন্দর যুঁই ফুলগুলো দেখছিলেন। যেন লেখাপড়ার কথায় তাঁর কী মনে পড়ে গেছে। 'তা বেশ বেশ—আমি তোমার জন্য—' বলতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি।

কোণার দিকের টেবিলে ক্রিং ক্রিং শব্দ হল। তিনি সেদিকে ছুটে গেলেন। কাল রাত্রে আজ সকালে আমার চোখে পড়েনি এ-ঘরে টেলিফোন রয়েছে। সম্ভবত রাত্রে ছিলেন না বলে তাঁকে কেউ ডাকেনি। হয়তো কানেকশন কেটে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রিসিভার তুলে ধরলেন।

'হ্যাঁ—এইমাত্র......'

... ...

'বটে, আচ্ছা দেখা যাবে। তুমি কেমন আছ ?'

'আড়াইটা—তিনটে হবে।' মিঃ রায়ের গলার স্বর হঠাৎ নীচের ধাপে নেমে গেল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ তো……আর শোন মীরা…'

কথাগুলো শোনা গেল না, কেবল নামটাই শুনলাম। মীরা। আমি ভাবতে লাগলাম। হয়তো কোন আত্মীয়া। হয়তো কোন বন্ধুর মেয়ে বা স্ত্রী বা বোন হবে। হয়তো—

রিসিভার রেখে দিয়ে তিনি ফিরে এলেন।

'না, আর দেরী নয়, তুমি চানটা সেরে এসো।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতের ঘড়ি দেখলেন। 'ইস্ দশটা বাজে—দেরী করে ফেললাম।'

বাথরুমে ঢুকে আমি আবার টেলিফোনের ওপারের নামটা মনে মনে উচ্চারণ করলাম। ওই নামটা আমার চিরদিন ভাল লাগে।

॥ পাঁচ ॥

একটা বাদাম গাছের ছায়ায় ট্যাক্সি দাঁড়াল। দুজনে নামলাম। তিন টাকার মত মীটারে উঠেছে। মনিব্যাগ খুলে মিঃ রায় টাকা বার করে দিলেন। ট্যাক্সিটা চলে গেল। জায়গাটা নিরিবিলি। রাস্তাটা ফাঁকা। দূরে একটা ঠেলাগাড়ি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

'এর নাম বেহালা।'

'নামটা শুনেছি।' আমি আস্তে বললাম।

'না শোনবার আছে কি—বিলেত থেকে তো আসনি।' রুমাল দিয়ে তিনি কপাল মুছলেন। ঘামছিলেন। 'এসো।'

আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

চোরকাঁটা-ভর্তি একটা মাঠের ওপর দিয়ে আমরা দুমিনিট হাঁটলাম। রাজপ্রাসাদের মতো বিরাট অট্টালিকার সামনে দুজন দাঁড়ালাম। মিঃ রায়কে দেখে দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল ও গেট্ খুলে দিল। 'এসো।' তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন। মিঃ রায়ের সঙ্গে আমি ভিতরে ঢুকলাম।

বড়লোকের বাড়ির সামনে যা থাকে। ফুলের বাগান, কৃত্রিম ফোয়ারা, শ্বেতপাথরের নগ্ন নারীমূর্তি। একপাশে গ্যারেজ। দুটো গাড়ি চোখে পড়ল। যেন দুটোই নতুন কেনা হয়েছে। চকচক করছে রং। আমাদের বারাকপুরের গেঞ্জেস হোসিয়ারীর রতনের কথাটা মনে পড়ল। পয়সা হলে মানুষকে দুটো রোগে ধরে। পুরোনো বৌ বাতিল করে দেওয়া আর পুরোনো গাড়ি বেচে দিয়ে নতুন গাড়ি কেনা। রতন কার মুখে কথাটা শুনেছিল কে জানে।

সিঁড়ি ভেঙ্গে আমরা প্রকাণ্ড বারান্দায় উঠে এলাম।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যত বড় বাড়ি—তুলনায় লোকজন কম। কোথাও কোন শব্দ নেই। বাগানে আম গাছের পাতা হাওয়ায় নড়ছিল। পাতার শব্দটা কানে আসছিল। পরিবেশটা তাই আরো বেশি রিক্ত উদাস ঠেকছিল।

কে একজন ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। মুখটা প্রথম দেখতে পাইনি। পরনে সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে নেটের গেঞ্জি। গেঞ্জিটা আধময়লা। লুঙ্গিটাও যেন বেশ ময়লা হয়েছে। লাল রং মেটে হয়ে গেছে। পায়ে চটি। তিন টাকা সাড়ে তিন টাকায় কলকাতার ফুটপাথে এসব চটি বিক্রী হয়। আমি দেখেই চিনতে পারলাম। রতন একবার কলকাতায় এসে এই চটি কিনে নিয়ে যায় মনে আছে। লোকটির পায়ের চটি দেখে হঠাৎ আমার রতনকে মনে পড়ে যাওয়াতে কেমন একটু হাসি পেল।

আমাদের পায়ের শব্দে তার মুখের ওপর থেকে খবর কাগজ সরে গেল। রোগা চেহারা। চোখে চশমা। নাকটা বেজায় উঁচু। যেন সারা মুখে একখানা নাকই আছে। গাল বসে গেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি এখনো পাকেনি। যেন দু-এক মাসের মধ্যেই পাকতে আরম্ভ করবে এমন একটা ফ্যাকাশে রং ধরেছে গোঁফ দাড়ি ও মাথার চুলের। যেন এই জন্যই চেহারা বেশি অপরিচ্ছন্ন রুক্ষ দেখাচ্ছে। আমাদের দেখে লোকটি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মনে হল দাঁতগুলি নকল। কাগজের মতো অস্বাভাবিক সাদা রং দেখে আমার এই ধারণা হল। না হলে এই বয়সে দাঁতের রং এমন হয় না।

নকল দাঁতে হেসে লোকটি মিঃ রায়কে যত না দেখল তার চেয়ে বেশি আমাকে দেখতে লাগল। চশমার ওপিঠে চোখের মনি দুটো বেশ বড় হয়ে উঠল—চকচকে হয়ে উঠল।

'এর কথা বলছিলে তুমি?'

'হুঁ।' মিঃ রায় সংক্ষেপে লোকটির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার

দিকে তাকালেন এবং মনে হল লোকটিকে নমস্কার করতে তিনি আমায় ইঙ্গিত করলেন। দু হাত একত্র করে আমি রোগা লম্বা লোকটিকে নমস্কার জানালাম।

'বোস বোস।' লোকটি আমার কাঁধে হাত রেখে কেমন যেন একটু চাপ দিয়ে আমায় একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। মিঃ রায় তার আগেই একটা চেয়ারে বসে গেলেন। দুজনকে বসতে দেখে লোকটি তার নির্দিষ্ট ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিল। চশমার ভিতর দিয়ে চোখের মণি বড় করে আবার আমায় দেখতে লাগল।

এবার আমি লাল হয়ে উঠলাম।

আমার মুখখানা যে সুন্দর সে-বিষয়ে আমি খুব বেশি সচেতন ছিলাম না কোনদিন। প্রয়োজন বোধ করিনি। একদিন একটি মানুষই শুধু আমার চেহারার প্রশংসা করেছিল—অবশ্য অনেকক্ষণ লাগিয়েই করেছিল। শুনে আমার ভাল লেগেছিল। তা বলে দেহে মনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম কি? বরং তখন আর একটি মুখ আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম। ভুরু নাক চোখ চোখের পলক, গাল গলা থুতনি বুক নিতম্ব অনেক কিছুই আমার দেখার ছিল। এবং কেবল মুখ না—ওর শরীরের প্রত্যেক অংশে আমি রূপ সৌন্দর্য লাবণ্য ছন্দসুষমা ইত্যাদি বলতে যা বোঝায় আবিষ্কার করে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। মেয়েদেরই রূপ তাকিয়ে দেখতে হয় আর সেই রূপের প্রশংসা শুনে তারা সুখী হয়। তারা আশা করে পুরুষ তাদের কেবল চোখ মুখ নাক না, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সব কিছুর রূপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে—আর তা বর্ণনা করবে। আমিও করেছিলাম, আর আশ্চর্য সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখার মতন ওকে দেখছিলাম। অবশ্য সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, সেই মুখ আমি ভুলে যাচ্ছি, ভুলে যেতে চেষ্টা করছি। ভুলতে না পারলে আমার যন্ত্রণার শেষ নেই এই বোধ থেকে আমি রৌদ্র ছায়া বন প্রান্তর ঘাস শিশিরের পরিচ্ছন্ন নির্মল জগৎ ছেড়ে এখানে পালিয়ে

এসেছি, ভিড়ের মধ্যে কলরবের মধ্যে কুশ্রীতার মধ্যে চলে এসেছি। আমি জানি আমি শুনেছি কলকাতা শহরটা কদর্য কুৎসিত। এই শহরের বাইরে সৌন্দর্য চাকচিক্য, ভিতরটা নোংরা।

'চেহারাটি বেশ, তাই তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। ভাল চেহারার ছেলে বা মেয়ে না হলে তোমার ওখানে কাজ পায় না। চেহারার ব্যাপারে তুমি বেজায় খুঁতখুঁতে।' মিঃ রায় হাসলেন।

মিঃ রায়ের কথায় রোগা লোকটি হাসল। যেন খুশিই হল কথাটা শুনে। কাগজের মতো ধবধবে সাদা নকল দাঁত বার করে হাসল আর চোখ বড় করে আমায় দেখতে লাগল।

তাই বলছিলাম, চেহারার কথায় তখন আমার অনেক কথাই মনে পড়ছিল। কাজেই এর পর দুজনের মধ্যে কি সব কথাবার্তা হচ্ছিল আমি ঠিক তেমন মনোযোগ দিতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝলাম ইজিচেয়ারে বসা রোগা লম্বা মানুষটাই আমার চাকরি দেবার মালিক। 'মানুষটাই দেখতে সাদাসিধে, অতি সাধারণ ভাবে থাকেন। কিন্তু তিনি কোটি টাকার মালিক। এই বাড়িও তাঁর।' একটু ফাঁক বুঝে মিঃ রায় আমাকে কানে কানে জানিয়ে দিলেন। তখন রোগা লোকটা আমাদের জন্য চায়ের কথা বলতে ভিতরে চলে গেছে।

'মোহিনী সামন্ত। স্বদেশী যুগের মানুষ। আমার বন্ধু। এক সঙ্গে আমরা জেল খেটেছি। এখন অবশ্য যুগটা পাল্টে গেছে। মোহিনী ও আমি দুজনেই গা থেকে স্বদেশীর গন্ধ ধুয়ে মুছে ফেলেছি। মিঃ রায় অল্প হেসে আর একটু পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন। মোহিনীবাবু ফিরে এলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো, দুজনের জন্য দু কাপ চা ও দুটো করে বিস্কুট এল। একটা টীপয় টেনে তার ওপর চায়ের কাপ ও বিস্কুট রেখে চাকরটা সরে গেল।

'চা খাও।' মোহিনীবাবু আগের মতন আমাকে দেখতে লাগলেন। ঘাড় গুঁজে আমি চায়ের কাপ টেনে নিলাম। মিঃ রায় ততক্ষণ চা খেতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। বিস্কুট

স্পর্শও করলেন না। মোহিনীবাবুর পীড়াপীড়িতে বিস্কুট কটা আমাকেই খেতে হল।

'আচ্ছা, তুমি আস্তে আস্তে বসে খাও বিনু, আমরা একটু কথা বলে নিই।' চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মিঃ রায় উঠে দাঁড়ান। মোহিনীবাবুও উঠে দাঁড়ান।

'বিনু—চমৎকার নাম, কেমন একটু মেয়েলী গন্ধ আছে নামটায়, কি বল সারদা।'

মিঃ রায় আড়চোখে আমাকে দেখে একটু হাসলেন শুধু, কিছু বললেন না। মোহিনীবাবুর হাত ধরে তিনি পাশের একটা কামরায় ঢুকলেন। দরজায় রঙ্গিন পর্দা ঝুলছিল। অনুমান করলাম ওটা মোহিনীবাবুর ড্রইং-রুম। চা শেষ করে আমি বেশ কিছুক্ষণ একলা চুপচাপ বারান্দায় বসে রইলাম। বসে থেকে ভাবলাম, মেয়েলী নামের ওপর দুজনের আগ্রহ উৎকণ্ঠা একটু বেশি। তাও আবার পুরুষের নাম নিয়ে। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। তারা দুজন বন্ধু। স্বদেশী যুগের মানুষ। এক সঙ্গে জেল খেটেছে। এখন যুগ পাল্টে গেছে। গা থেকে স্বদেশী গন্ধ মুছে ফেলেছে দুজন। মিঃ রায়, কাল রাত থেকে লক্ষ্য করছিলাম, মাঝে মাঝে বেশ রসিয়ে কথা বলেন। মানুষটা রসিক। তাঁর বন্ধু মোহিনী সামন্তও এমন রসিক কি না চিন্তা করতে লাগলাম।

কথা শেষ করে দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'আমাদের কাজ শেষ হল, বিনু, চল।'

মিঃ রায় আর বসলেন না। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

মোহিনীবাবু আমাদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এসেছিলেন। আধময়লা লুঙ্গি গেঞ্জি ও তিন টাকা দামের চটি পরা কোটীপতি মানুষটাকে এবার আমি খুঁটিয়ে ভাল করে দেখছিলাম। কেননা তিনি আর আমার দিকে তেমন করে তাকিয়ে ছিলেন না, বন্ধুর সঙ্গে বথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন। দুজন আগে আগে হাঁটছিলেন। আমি পিছনে ছিলাম।

॥ ছয় ॥

'তোমার চাকরি ঠিক হয়ে গেল।' মিঃ রায় ট্যাক্সিতে বসে আমায় কথাটা বললেন।

'কোথায়?' এত চট করে কাজ হয়ে গেল জেনে আমিও বেজায় খুশি। অবশ্য কাজটা কি ধরনের জানতে ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছিল। সারদা রায়ের মুখ দেখছিলাম চোখ দেখছিলাম। তিনি গাড়ির জানালার বাইরে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করছিলেন। একটু পর তিনি আমার চোখে চোখ রাখলেন।

'কিন্তু খুব সাবধান—মোহিনীর কাগজের অফিসে অনেক লোক, অনেক মতবাদ তাদের। আমি যে তোমায় নুন খেয়ে গুণ গাইবার উপদেশ দিচ্ছি তা মনে করো না। বা যেহেতু কাগজের মালিক আর সেখানে তুমি কাজ করছ বলে নিতান্তই তার বশংবদ হয়ে থাকবে তাও আমি বলব না। তোমার স্বাধীন চিন্তা ব্যক্তিত্ব নিজস্ব মতবাদ যা আছে থাকুক। কিন্তু নিজের ডিউটি করে যাবে। ঐ যে বললাম, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে মিশে দল পাকাবার, মালিকের বিরুদ্ধে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবার চেষ্টা করবে না।'

'না না ছি—' আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। বুঝলাম যেখানে চাকরি করতে যাচ্ছি সেখানে নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল চলেছে অথবা গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা আছে, বা গণ্ডগোল হয়েছিল—থেমে গেছে, এখন থেকে নতুন কর্মচারী নিয়োগের সময় আগেভাগেই তাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।

'বুঝলে না, সারাদিন রাস্তায় ক্যা ক্যা করে ঘুরে মরেছে একটা চাকরি বাগাতে এর দরজায় ওর দরজায় হন্যে কুকুরের মতো ঘুরেছে —কিন্তু দেখা গেল, দয়া করে কেউ তাকে কাজ দিল, যা-হোক

একটা চাকরিতে বসিয়ে দিল কি পরদিন থেকে কোমর বেঁধে তিনি লেগে গেলেন দাবি তুলতে নানারকম আওয়াজ বার করতে—ম্যানেজার মালিকের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গার করতে।'

'আমি এসব পছন্দ করি না। যারা এসব করে তারা অকৃতজ্ঞ। বেইমান—এসব লোককে আমি ঘৃণা করি!' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বললাম। মিঃ রায়কে সন্তুষ্ট করতে আরো কি বলা যেতে পারে চিন্তা করছিলাম।

'না, তুমি এসব করবে না। তার কারণ, হয়তো মোহিনীর কাগজের অফিসে যারা আছে তাদের মধ্যে দুষ্ট লোকও আছে, আছে বা নেই, কিন্তু যদিও বা থাকে তুমি তাদের এড়িয়ে চলবে। কেননা—কেননা—' ট্যাক্সিটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে একটা ভারী লরী দাঁড়িয়ে আছে, মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, একটা লরী শুধু না, অনেক গাড়ি পর পর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বুঝলাম রাস্তা পরিষ্কার নেই। পুলিশ হাত উঁচিয়ে আছে। কলকাতার রাস্তা আজ যত ভাল করে দেখছি আর কোন দিন দেখিনি। আমার মনে খুব আনন্দ হচ্ছিল। আসতে না আসতে একটা কাজ জুটে গেল। আর চাই কি। এখন থেকে আমিও কলকাতার মানুষ হয়ে গেলাম। স্বাধীনভাবে থাকব, বেড়াব খাব সিনেমা দেখব। কলকাতার মাঠে খেলা দেখিনি। আমার কতদিনের ইচ্ছা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল কালীঘাট মহামেডান স্পোর্টিংএর খেলা দেখব। এবার সুযোগ হবে।

রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল।

'কেননা তুমি যদি আর দুটি দুষ্ট লোকের সঙ্গে মিশে মোহিনীর বিরুদ্ধে কোন রকম ষড়যন্ত্র পাকাও বা তার নিন্দাচর্চা কর, আর সে কথা মোহিনীর কানে যায় তো আমি মোহিনীর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।' মিঃ রায় আমার কাঁধে হাত রাখলেন। 'কেন

বুঝতে পারছ?'

'আপনি তো মোহিনীবাবুর অফিসে আমায় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন—কাজেই আমার দোষ-ত্রুটি, সে ধরনের কোন অপরাধ আপনাকেই আগে পাবে।'

'হ্যাঁ, কারণ মোহিনী আমার বন্ধু। আমার বিশেষ বন্ধু। আমার লোক হয়ে যদি শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলাও গলা মেলাও তো মোহিনী দুঃখ পাবে বেশি—আর লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' আমাকে দিয়ে সে রকম কিছু হবে না।'

'আমিও তাই আশা করছি। তোমার চেহারা বলছে তুমি সেরকম ছেলে নও।' সারদা রায় আমার কাঁধে চাপ দিলেন। মোহিনীও তখন চেয়ারে বসতে বলে আমার কাঁধে চাপ দিয়েছিলেন মনে পড়ল।

'এই যে, আমরা এসে গেছি, রোখো।'

ট্যাক্সি দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লাম।

॥ সাত ॥

'দৈনিক যুগভেরী' কাগজের অফিস। অবাক হয়ে গেলাম। একটা দৈনিক খবর কাগজের অফিস এত বড় হতে পারে, এত সব লোক কাজ করতে পারে আমার কিন্তু ধারণা ছিল না! আজ আমার মনে পড়ল পরেশের দোকানে বসে চা খেতে খেতে কতদিন আমি এই কাগজের পৃষ্ঠাগুলি উল্টে-পাল্টে খেলার খবর পড়েছি, খুন-জখমের সংবাদ পড়েছি, নারীহরণ নারীধর্ষণ ধর্মঘট লক আউট ভূমিকম্প ট্রেন-দুর্ঘটনা আণবিক বোমা-বিস্ফোরণ, পণ্ডিত নেহেরুর কাশ্মীর ভ্রমণের কাহিনী এবং আরো কত কি খবর পড়েছি। আমাদের বারাকপুরের গেঞ্জেস হোসিয়ারীর মিলে এই কাগজ যায়। আমি যখন নৈহাটী কলেজে পড়তাম তখন কমন রুমে বসে এই কাগজ পড়তাম। রোজ ট্রেনে চলতে ফিরতে লোকের হাতে হাতে যুগভেরী দেখেছি।

আজ থেকে সেই যুগভেরী কাগজের আমিও একজন কর্মচারী বিশ্বাস করতে বাধছিল। মিঃ রায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি সব দেখলাম। কত বড় একটা যন্ত্র। একটা ঘর জুড়ে রয়েছে যন্ত্রটা। এর নাম 'রোটারী মেশিন'। কি করে এই মেশিনে কাগজ ছাপা থেকে আরম্ভ করে কাগজটি কেটে ভাঁজ হয়ে বেরিয়ে আসে মিঃ রায় হাত নেড়ে নেড়ে আমায় বুঝিয়ে দিলেন। আর একটা ঘরে দেখলাম সারি সারি কাঠের ডালায় সীসার টাইপ সাজিয়ে কত লোক বসে কাজ করছে। এরা কম্পোজিটার। একটা ঘরে থরে থরে ভাগে ভাগে যুগভেরী সাজানো হচ্ছে। দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে। 'এগুলি ডাক এডিশন। এখুনি মফঃস্বলে পাঠানো হবে।' মিঃ রায় বললেন, 'এক কলকাতা শহরে চল্লিশ হাজার কাগজ রোজ বিলি করতে হয়—'

আমরা দোতলায় উঠলাম।

এটা সার্কুলেশন ডিপার্টমেণ্ট, ওটা বিজ্ঞাপন বিভাগ, ওটা একাউণ্টস সেক্‌শন—হুঁ, ওখানে চীফ এডিটার বসেন। প্রধান সম্পাদক। তারপর আছে এ্যাসিস্টেণ্ট এডিটারদের ঘর। কিন্তু আমি কোথায় বসে কাজ করব। আমার জন্য কোন্ বিভাগ। কাজটাই বা কি ধরনের ভেবে সারা হচ্ছিলাম। কেননা আমি গেঞ্জির কলে কাজ করেছি। এখানে যতগুলি বিভাগ আছে একটা বিভাগেরও কাজ আমার জানা নেই। শিখতে হয়, মিঃ রায় বলছিলেন, না শিখলে তুমি মেশিন চালাতে পারবে না, টাইপ সাজাতে পারবে না। বিজ্ঞাপন বিভাগে বসেও প্রথম দিনই তুমি কিছু কাজ করতে পারবে না। কাজটা জানতে হবে, বুঝতে হবে। তেম্নি একাউণ্টস সেকশন। আর যারা এডিটার তাদের অনেক বিদ্যা, বিস্তর পড়া-শোনা করতে হয়। আমার ভয় হচ্ছিল তেমন লেখাপড়া শিখিনি যখন, হয় মেশিন ঘরে কি কম্পোজিটারদের ঘরে বসে আমাকে হয়তো তাদের কাজ শিখতে হবে। চাকরি হল মানে কাল থেকেই আমি মাইনে পাচ্ছি না। শিক্ষানবীশ হয়ে থাকতে হবে। এপ্রেণ্টিসশীপ কথাটা আমার জানা ছিল। বুকটা হঠাৎ কেমন দমে গেল। খবরের কাগজের অফিস ছাড়া মিঃ রায় কি আমার জন্য আর কোথাও চেষ্টা করতে পারলেন না? কাজ শেখা অবস্থায় আমি কোথায় থাকব, কি খাব?

'এসো ইদিকে এসো।

সারদা রায় আমায় আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন।

'এটা বাংলা কাগজ। কিন্তু খবর আসে সব ইংরেজীতে। ঐ ত্থাখ ছোট আলমারীর মতো কাঠের বাক্সটা থেকে আপনা থেকে কেমন খবর টাইপ হয়ে বেরোচ্ছে।' আঙুল দিয়ে সারদা রায় বাক্সটা আমাকে দেখালেন। একটা না, সারি সারি তিনটে বাক্স ঘসঘস করে আওয়াজ করছে আর ভিতর থেকে টাইপ করা লম্বা লম্বা কাগজ

বেরিয়ে আসছে। তিনটে বাক্সের ওপরে কাচ পরানো ডালা। পাশে সুইচ্ বোর্ড চোখে পড়ল। মেসিনগুলি ইলেক্‌ট্রিকে চলে এটুকু বুঝলাম। আজকাল ইলেক্‌ট্রিক ছাড়া কোন্ মেসিনই বা চলে আমাদের গেঞ্জির কারখানার সব কটা মেসিন ইলেকট্রিকে চলে।

চার-পাঁচটি ছেলে মেয়ে টেবিলে বসে মাথা গুঁজে কি যেন লিখছে। একটি মেয়ে মেসিন থেকে কাগজগুলি ছিঁড়ে একটা টেবিলে এনে জড় করছে। একটি সুন্দর চেহারার ছেলে খবরগুলি বাছাই করে যারা টেবিলে বসে কলম চালাচ্ছে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। 'এরা সাব এডিটার—ইংরেজীতে লেখা খবরগুলোর বাংলা তর্জমা করছে। এটা নিউজ ডিপার্টমেণ্ট। তোমার তর্জমায় হাত আছে?' মিঃ রায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি মাথা নাড়লাম ও দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বুঝলাম এখানেও আমার কোন কাজ নেই। যে মেয়েটি মেসিন থেকে খবরগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে আনছে তার চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি। বেণীটা কোমরের নীচে নেমে গেছে। বেণীর মাথায় লাল রিবন বাঁধা। কেমন আফশোস হচ্ছিল। আহা, যদি এদের সঙ্গে এই ঘরে বসে কাজ করতে পারতাম।

'এসো।'

মিঃ রায়ের সঙ্গে আর একটা ঘরে ঢুকলাম।

'এরা প্রুফ-রীডার। বড় মেসিনে ওঠার আগে খবরগুলো হ্যাণ্ডমেসিনে আগে ছাপা হয়ে আসে। ছাপার অনেক ভুলচুক থাকে। এখানে এরা সেগুলো সংশোধন করে দেয়।'

দেখলাম এখানেও ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে বসে কাজ করছে। মেয়েই বেশি। আর সব কটির চেহারা সুন্দর। মোহিনীবাবু সুন্দর চেহারার ছেলে-মেয়েদেরই আগে কাজ দেন।

কথাটা মনে অছে। আমার চেহারাও সুন্দর। তখন তিনি প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু সুন্দর মুখ নিয়ে আমি এখানে কী কাজে লাগব ভেবে ভিতরে ভিতরে ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করছিলাম।

'তোমাদের গেঞ্জির কলে যেমন সিফ্‌ট আছে—এখানেও তা আছে। গেঞ্জির কারখানায় সিফ্‌টে সিফ্‌টে কাজ হয়, কারণ মালিকের স্বার্থ আছে বলে—প্রোডাকশন বাড়লে মুনাফার অংক বাড়বে। এখানে কিন্তু তা না। এখানে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে খবর আসছে। আর সেসব খবর তোমরা রোজ কাগজে পড়বে বলে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নানা সিফ্‌টে এখানে কাজ হচ্ছে।'

অর্থাৎ জনসাধারণের সেবা করাই মোহিনীবাবুর উদ্দেশ্য। তাই সিফ্‌টে সিফ্‌টে লোক লাগিয়ে তিনি অফিসের কাজ চালু রাখছেন। সারদাবাবু তাই বলতে চাইছেন কি না আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। একটা সরু বারান্দা পার হলাম। একটি মেয়ে আমাদের আগে আগে হাঁটছিল। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। এর চোখেও চশমা। সেই মেয়েটির কথা আমার মনে পড়ল। কাল বিকেলে সারদাবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়িটায় ঢুকব কিনা গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিলাম। আর তখন ও রিকৃশা থেকে নেমেছিল। আশ্চর্য, আজ বেলা দশটা পর্যন্ত আমি ঐ বাড়িতে কাটিয়ে এলাম। একবার চোখে পড়ল না সেই মুখখানা।

একটা ঘরের দরজায় আমরা দাঁড়ালাম।

'এখানে বার্তা সম্পাদক বসেন। যাকে বলে নিউজ এডিটার। মিঃ রায় আমার হাত ধরে ভিতরে ঢুকলেন।

॥ আট ॥

বরং বলা যায় রণধীরবাবুর চেহারাটা মেয়েলী। সরু নাক পাতলা ঠোঁট টানা চিকণ ভুরু। রংটাও ফর্সা। আমাদের সঙ্গে যত বেশি না কথা বললেন টেলিফোনের রিসিভার তুলে বাইরে মানুষের সঙ্গে কথা বললেন অনেক বেশি। সারদাবাবু এক সময় আমার কানে কানে বললেন 'কাগজের অফিসে নিউজ এডিটারকে সবচেয়ে বেশি টেলিফোন ধরতে হয়।'

তাই তাকিয়ে দেখছিলাম।

কিন্তু সবই কি কাজের কথা। নিউজের কথা। আমার যেন মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। এইমাত্র হেসে হেসে রণধীর আদুরে গলায় রিসিভারে মুখ লাগিয়ে যার সঙ্গে কথা বলছিল সে কি খুব জরুরী কাজে রণধীরকে ডেকেছিল।

কেন জানি আমার মনে হল কোন মেয়ের সঙ্গে বার্তা সম্পাদক কথা বলছে। কেননা একবার আমি তাকে নীচু গলায় দুষ্টু মেয়ে কথাটা বলতে শুনে ফেললাম।

চা এল। রাণধীর হাত থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখল। আমায় আর একবার দেখল এবং এই নিয়ে পঞ্চমবার আমাকে অভয় দিল অর্থাৎ খুব সহজ কাজ। কিছুই না। কলকাতা শহরে নিত্য নানা ঘটনা ঘটছে। আগুন লাগছে, চুরি রাহাজানি হচ্ছে, রাস্তায় চলতে মানুষ ট্রামবাসের তলায় চাপা পড়েছে, না খেয়ে ফুটপাথের ওপর মরে পড়ে থাকছে। একটু চোখ-কান খোলা রেখে শহরের পথে তুমি হেঁটে যাও। ঘটনার পর ঘটনার শেষ নেই। এগুলো খবর। বেশ মুখরোচক খবর। লোকে সকালবেলা কাগজ খুলে কেবল রাজনীতি সমাজনীতি পড়তে চায়, দিল্লী বোম্বাইয়ের খবর জানতে চায় মনে করা ভুল।

আমাদের এই শহরে রোজ এমন সব ঘটনা ঘটছে সেগুলো জানতে মানুষের আগ্রহ কম দেখা যায় না।

'প্রথম প্রথম তুমি তাই কর। ছোট ছোট খবর যোগাড় করে আনবে।' এবার সারদা রায় কথা বললেন। 'খুব সহজ কাজ। অর্থাৎ তোমাকে রিপোর্টার হিসাবে নেওয়া হল। তারপর যখন হাত পাকবে—'

'আমাদের পাঁচ জন রিপোর্টার আছে।' রণধীর বলল। 'খেলার মাঠ এসেম্বলী রাইটার্স বিল্ডিং রাজভবন দমদম এয়ারপোর্ট ডক হাইকোর্ট ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ম অমুক লাইব্রেরী তমুক ক্লাব—খবরের তো আর শেষ নেই। এখনি সেগুলো তোমার পক্ষে করা শক্ত হবে। এখন ছোট ছোট খবর স্টে ইন্‌সিডেণ্টস্—যে সব ঘটনা শহরে নিত্য ঘটছে সেগুলো কালেক্ট করতে হবে।'

'হুঁ তারপর যখন হাত পাকবে তখন বড় বড় জায়গায় বড় বড় মিটিং-এ গেদারিং-এ—বুঝলে না।' সারদা রায় আমার কাঁধে হাত রাখলেন। রণধীর হয়তো সেটা লক্ষ্য করল না। কেননা একসঙ্গে তিনটি মেয়ে তখন ঘরে ঢুকেছে। আর রণধীর অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'তোমার চাকরি ঠিক হয়ে গেল। কাল থেকে লেগে যাও। আপাতত একশ টাকা করে দেবে—মোহিনীর সঙ্গে আমার সেসব কথা অলরেডী হয়ে গেছে।' রাস্তায় নেমে সারদা রায় বললেন। তিনি হাতের ঘড়ি দেখলেন। একটা বেজে দশ। দুটো ত্রিশে তাঁকে এক জায়গায় যেতে হবে। কোথায় যাবেন আমি জানি না। তবে সকালে বাড়িতে তিনি টেলিফোনে একজনের সঙ্গে যে কথা বলছিলেন আমার মনে ছিল। মীরা নামটাও মনে ছিল।

'এসো, এখন দুটো ভাত খাওয়া যাক—সারাদিন আর চা খেয়ে কত চলে।'

মিঃ রায়ের সঙ্গে একটা হোটেলে ঢুকলাম।

মুর্গির মাংস আর ভাতের অর্ডার দেওয়া হল।

'আমি দু'বেলা বাইরে খাই। চা টিফিনটাও দোকানে সেরে ফেলি।' মিঃ রায় বলছিলেন, 'ঘরে রান্না বান্নার আয়োজন রাখার ঝঞ্ঝাট অনেক। একটা চাকর রাখতে হয়।'

'তাই তো।' আমি সায় দিলাম। কিন্তু তিনি এমন একলা কেন। বয়স তো কম হল না। খেতে খেতে ভাবলাম।

'তোমাকে কিন্তু আমার সঙ্গেই থাকতে হবে।' সারদা রায় হঠাৎ আমার চোখ দেখলেন।

'আপনার অসুবিধা হবে না?'

'কিস্সু না, বরং সুবিধা হবে। আমার একটি মানুষের দরকার। আমি তোমার মতো একজনকে খুঁজছিলাম।'

কথা বললাম না। সারদা রায় একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন। আমি তাঁর মুখ দেখতে আর একবার চোখ তুললাম। তিনি চট্ করে ঘাড় গুঁজে মুর্গির ঠ্যাং চুষতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'আমারও অসুবিধা হবে না। বরং আপনার সঙ্গে থাকতে ভাল লাগবে।' বললাম। যেন না বলে থাকতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল তিনি অসহায়। আমার মনে হচ্ছিল আমাকে ভালবেসে, আমাকে স্নেহ করে এক ঘরে তাঁর সঙ্গে রেখে তিনি তৃপ্তি পেতে সান্ত্বনা পেতে চান।

তাঁর মনে ক্ষত আছে। আমার মন বলল। আমার মনে ক্ষত ছিল। ক্ষত ভুলতে এখানে চলে এসেছি। যেন এসে আর একটা ক্ষত আবিষ্কার করলাম।

খাওয়া শেষ করে ওয়াশ স্ট্যাণ্ডে হাত-মুখ ধুয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তিনি হাত ধুয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। আমাকে লক্ষ্য করলেন। আমার ভেজা হাতের দিকে তাকালেন।

'রুমাল নেই তোমার ?'

'আছে, বড্ড নোংরা হয়ে গেছে। তাই ঘরে রেখে এসেছি।' ভয়ংকর লজ্জা পেলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

তিনি পকেট থেকে অতিরিক্ত একটা রুমাল বার করলেন। ধোয়া ভাঁজ করা। এখনো ব্যবহার করা হয়নি। যেন পরে দরকার মত ব্যবহার করবেন বলে সঙ্গে রেখেছেন।

'সঙ্গে সর্বদা রুমাল রাখবে।' ভাঁজ করা রুমালটা আমার হাতে তুলে দিলেন তিনি। 'তুমি হয়তো ভেজা হাতটা এখনি জামায় মুছতে।'

আমার ঘাড়টা আরো নীচু হয়ে গেল।

'তোমার জামা-কাপড়ের অভাব দেখছি। আমি টাকা দিচ্ছি, কিনে নাও। অন্তত আধ ডজন রুমাল রাখবে।' পকেট থেকে মনিব্যাগ তুললেন তিনি। টাকাটা বার করার সময় কি চিন্তা করলেন। 'হুঁ, তোমার বিছানা নেই। বিছানাও করিয়ে নাও।'

আমি হাত পেতে টাকা নিলাম। তাঁর কথার ওপর কথা বলতে সাহস পেলাম না। 'দৈনিক যুগভেরী'র টাকা পাচ্ছি এক মাস পর। এই ক'টা দিন না হয় একটু অসুবিধা করে কষ্ট করে কাটিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু মনের সেই ইচ্ছা তাঁকে জানাবে কে। বস্তুত তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর আন্তরিকতা আমাকে ক্রমেই যেন কেমন বিহ্বল আবিষ্ট করে দিচ্ছিল। তাই চুপ করে রইলাম।

বিল চুকিয়ে দিয়ে আমরা রাস্তায় নামলাম। সারদা রায় ঘড়ি দেখলেন।

'আমি দেরী করব না। কেনা কাটা সেরে ঘরে ফিরে যাবে। এই যে চাবি।'

ট্যাক্সির জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

'তোমার বাস এসে গেছে। এই বাসে উঠে পড়। বৌবাজার নামবে। শেয়ালদার কাছাকাছি হীরালাল মানিকলালের দোকান দেখতে পাবে। বড় দোকান। সাইন বোর্ড রয়েছে। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সব কিনতে পারবে। ফিকস্‌ড প্রাইস—অত্যন্ত রিলায়েবল দোকান। ঠকবার ভয় নেই। আমি চলি। একটু এগিয়ে না গেলে ট্যাক্সি ধরা যাবে না।

তিনি চলে গেলেন। আমি বাস্‌-এ উঠে পড়লাম।

সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা—রোজ ট্যাঁকে পয়সা গুঁজে ভাত খেতে যাওয়ার দরকার নেই।'

আমি ঘাড় কাত করলাম।

'পার্শের ঝালটা ওরা চমৎকার রান্না করে। বলতে হয় ওটা ওদের স্পেশ্যাল আইটেম—হা—হা।' হেসে চা শেষ করে সারদা রায় সিগারেট ধরালেন। আমার মনে হল সিগারেট তিনি খুব কম খান। এর আগে আমি তাঁকে একবারও সিগারেট খেতে দেখিনি।

'যাকগে—আমি বাথরুমে চললাম। তুমি তো সাড়ে বারোটায় বেরোচ্ছ—যুগভেরীর নিউজ এডিটার তাই বলছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'আজ হয়ত তোমাকে বাইরে পাঠাবে না। অফিসে বসে পুরোনো যুগভেরীর ফাইল পড়তে দেবে। প্রথম দিন তারা তাই করতে বলে।' আর একটু হেসে তিনি বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

লণ্ডীতে কি কি যাবে আমি তখনি বাছতে লেগে গেলাম।

॥ দশ ॥

রিপোর্টাররা যে-ঘরে বসে সেই ঘরটা দোতলার সবচেয়ে নিরিবিলি নির্জন ঘর। নিউজ এডিটারের ঘর পার হয়ে অন্ধকার মতন সরু একটা বারান্দা। বারান্দার ডানদিকে সেই ঘর। মনে হল দক্ষিণটা খোলা। দুটো বড় বড় জানালা আছে। জানালায় দাঁড়ালে একটা প্রকাণ্ড বকুল গাছ চোখে পড়ে। প্রথম দিনই এটা আবিষ্কার করলাম। কিন্তু তবু ঘরের ভিতরটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার ঠেকছিল। আমি ভিতরে ঢুকতে বেয়ারা আলো জ্বেলে দিল।' পাখা খুলে দিল। বুঝলাম দিনের বেলায়ও আলো জ্বেলে কাজ করতে হয় এ-ঘরে। অধিকাংশ টেবিল চেয়ার ফাঁকা। আমি অবশ্য প্রথম দিন বুঝতে পারিনি পরে বুঝেছিলাম। দিনের বেলা এ-ঘর ফাঁকা থাকলেও রাত্রে ঘরের ভিতরের চেহারা বদলে যায়। তখন সব কটা চেয়ার-টেবিল নিয়ে রিপোর্টাররা বসে যায়। সারাদিন ঘুরে ঘুরে তারা এ-খবর সে-খবর যোগাড় করে। রাত্রে অফিসে এসে সেগুলি গুছিয়ে কখনো বা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বড় বড় সংবাদ তৈরী করে প্রেসে পাঠিয়ে দেয়। পরদিন নিজস্ব সংবাদদাতার খবর হয়ে সেগুল কাগজে বেরোয়। বলতে কি কাজটা আমার ভাল লাগল। গেঞ্জির কলের কাজের চেয়ে এ-কাজ অনেক ভাল। তা ছাড়া রিপোর্টার হওয়ার সুবিধা একটানা সাত আট ঘণ্টা অফিসে আটক থাকতে হয় না। বাইরে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা আছে।

কেননা বাইরে ঘুরে ঘুরেই তো খবর যোগাড় করতে হবে। আর কলকাতার রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কত কি চোখে পড়ে।

প্রথম দিন আমি যুগভেরীর পুরোনো ফাইল উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। রথীনবাবু এক সময় এসে আমার পিঠে হাত রেখে কি

করে ছোট নিউজ বড় করতে হয়, একটা সাধারণ ঘটনাকে চমকপ্রদ চাঞ্চল্যকর সংবাদের রূপ দেওয়া যায় সেই সম্পর্কে কিছু মৌলিক উপদেশ দিলেন।

কিন্তু রথীনবাবু বেশিক্ষণ আমার জন্য ব্যয় করতে পারেননি। বেয়ারা ছুটে এসে জানাল আপনার টেলিফোন—ব্যস্ত হয়ে রথীনবাবু তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

একলা বসে ফাইলটা ঘাঁটছিলাম। হঠাৎ আমার সামনে লাল একটা ঝলক ভেসে উঠতে চোখ তুললাম।

আমার দু-চোখ স্থির হয়ে গেল।

যেন আগুন জ্বলছিল চোখের সামনে। কেবল লাল শাড়ি বলে না, ওর গায়ের রংটাও এত উজ্জ্বল উদ্যত যে মনে হচ্ছিল একটি নির্ধূম অগ্নিশিখা সামনে এসে দাঁড়াল। আমি অনেক রকমের খোঁপা দেখেছি, বেণী দেখেছি। নিত্য নতুন ফ্যাশান বেরোচ্ছে। কাজেই কোন্ বেণীর কি নাম কোন্ খোঁপার কি নাম বলতে পারব না।

নাম জানতে চেষ্টাও করিনি।

কেবল তাকিয়ে থাকি, তাকিয়ে দেখি।

দেখাটাই আনন্দ।

কিন্তু যে এসে দাঁড়াল তার মাথার ওটাকে বেণী বলব কি খোঁপা বলব ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। ওর শাড়ির রং গায়ের রঙের, মতো চুলটাও যেন একটা বিস্ময় হয়ে চোখের সামনে জ্বলছিল।

বেয়ারাটা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমার সঙ্গে ও কথা বলল না। আঙুল তুলে বেয়ারাকে কাছে আসতে ইসারা করল।

'মিঃ রায় কখন আসবেন বলতে পার?'

বেয়ারা মাথা চুলকাতে লাগল, ভাবতে লাগল, তারপর হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা আমি রথীনবাবুকে জিজ্ঞেস করে আসছি।'

মেয়েটি মৃদু হাসল।

'না থাক, ওঁকে আর বিরক্ত করে লাভ নেই। নিউজ এডিটারের ঘরেই আমি প্রথম গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে এ-ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।'

বেয়ারা আমার দিকে তাকাল।

অর্থাৎ সে বুঝে গেল মিঃ রায়ের খবর আমি হয়তো বলতে পারব। কারণ কাল সে লক্ষ্য করেছে হয়তো, আমি সারদা রায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অফিস দেখছিলাম। আর আমি মিঃ রায়ের লোক—তাঁর খবর আমি রাখি, এই ভেবে নিউজ এডিটারও মেয়েটিকে এ-ঘরে পাঠিয়েছেন।

বেয়ারা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছিল। মেয়েটিও করছিল।

অর্থাৎ এখন ও বুঝতে পেরেছে মিঃ রায়ের খবর জানতে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে। অথচ কথা বলতে পারছিল না।—যেন জড়তা কাটছিল না, সঙ্কোচ কাটছিল না।

মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা ঘটতে আমি দেখেছি।

কোন একটি বিশেষ ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ে—বা কোন মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলে চট্ করে কথা বলতে পারে না।

যেন কি একটা বাধা এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়ায়।

যেন ছেলেটির চোখে এমন কোন ভাষা ফুটে ওঠে যা পড়া মাত্র মেয়েটি বোবা হয়ে গেল। বা মেয়েটির তাকানোর মধ্যে ছেলেটি এমন কিছু দেখল যার ফলে ছেলেটির মুখের ভিতর জিভটা আঠা হয়ে জুড়ে গেল এবং এটাও সত্য একজন যখন সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, চুপ করে থাকে তখন আর একজনের পক্ষে সঙ্কোচ-দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়ে।

সংক্রামক রোগের মতো একজনের সঙ্কোচ আর একজনকে আক্রমণ করে।

আমিও তাই চুপ করে ছিলাম। কথা বলতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকছিল।

তুজনকে চুপ থাকতে দেখে অগত্যা বেয়ারাকে মুখ খুলতে হল।

'আপনি জনেন রায়বাবু কখন আসবেন ?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'আমায় কিছু বলেন নি।' তারপর কি ভেবে বেয়ারাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তিনি কি যুগভেরী অফিসে রোজ আসেন ?'

বেয়ারা ঘাড় কাত করল।

'বড়বাবুর বন্ধু রায়বাবু। রোজই একবার আসেন। কখন আসেন তার ঠিক থাকে না। এসেই বড়বাবুর ঘরে গিয়ে ঢোকেন। তুজনে বসে গল্প করেন, চা খান।'

'বড়বাবু কে ?'

'মোহিনীবাবু।' বেয়ারা দাঁত বার করে হাসল। 'এই কাগজের মালিক, আপিসের মালিক, প্রেস গাড়ি সাইকেল লরী সবই তিনির।'

কথা বললাম না। মেয়েটি চুপ করে শুনছিল।

'আপনার কি রায়বাবুর সঙ্গে দেখা করার খুব দরকার ?' বেয়ারা ওকে প্রশ্ন করল। আমি অসন্তুষ্ট হলাম।

'দরকার না থাকলে আসবেন কেন ?' আস্তে বললাম।

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন।' বেয়ারাটা আবার প্রশ্ন করে বসল। এত কথা বলছিল বলে লোকটার ওপর আমার এমন রাগ হচ্ছিল।

যেন তার তুটো প্রশ্নই খারিজ করে দিতে আমি তৎক্ষণাৎ মেয়েটির চোখের দিকে তাকালাম।

'আপনি কি একটু বসবেন। যদি ইতিমধ্যে মিঃ রায় এসে যান ?'

'কিন্তু কত সময় বসবেন ?' বেহায়া বেয়ারা আমার মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল। 'তিনির আসার কিছু টাইমের ঠিক নেই।

রাত দশটায়ও আসেন আবার সন্ধ্যা পাঁচটা ছটায়ও আসেন। এক একদিন দুপুরেও এসে যান। বড়বাবু কখন আসেন তারও কিছু ঠিক থাকে না।'

মেয়েটি দোরের দিকে ঘাড় ফেরাল। হয়তো চলে যাবে কিনা ভাবছিল।

'তিনিরা তো আর স্টাপের লোক না—স্টাপের লোকেদের সময় ঠিক করা আছে টাইম বাঁধা আছে।' বেয়ারাটা যেন থামতে চাইছিল না।

বিরক্ত হয়ে আমি পুরোনো যুগভেরীর পৃষ্ঠায় চোখ নামালাম। মনে হচ্ছিল মেয়েটি দোরের দিকে সরে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে—।

'আচ্ছা দিদিমণি, আপনি একটা কাজ করুন না। রথীনবাবুর ঘরে গিয়ে রায়বাবুর বাড়িতে একটা টেলিফোন করে দেখুন।' বেয়ারা পিছন থেকে বলছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ধমক লাগালাম।

'কোথায় টেলিফোন করবে। ঘরে তালা দিয়ে আমরা দুজন একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। ঘরে কেউ নেই, ফোন ধরবে কে ?'

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে বড় বড় চোখে আমাকে আর একবার দেখল। কিন্তু এবারও সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলল না বা আমায় কিছু প্রশ্ন করল না।

কিন্তু আমাদের বেয়ারা শ্রীমান তারাচাঁদ (নামটা পরে জেনেছিলাম) দমবার ছেলে নয়। তৎক্ষণাৎ আকর্ণ হেসে বলল, 'তা হলে বড়বাবুর বাড়িতে টেলিফুন করলে জানা যাবে। দুজন দারুণ বন্ধু। থিরি নাইন ছিক্ জিরো—বড়বাবুর টেলিফুন নম্বর আমার মুখস্থ।'

'থাক, দরকার নেই। আমি আর একদিন আসব।' তারাচাঁদের সঙ্গেই শেষবারের মতো কথা বলে মেয়েটি বেরিয়ে গেল। কিন্তু তারাচাঁদও দাঁড়িয়ে রইল না। সিঁড়ি পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল। আমার মনে হয় তারাচাঁদ সেদিন দোতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে তারপর

একতলার সিঁড়িও ভেঙ্গেছিল। আমার মনে হয় দিদিমণির সঙ্গে সে রাস্তায় নেমেছিল।

আমার চেয়ে এক বছরের বড় বা আমার চেয়ে এক বছরের ছোট—যা-ই হোক। আমার কাছাকাছি বয়সের বলে তারাচাঁদের মন বুঝতে আমার এতটুকু বেগ পেতে হয়নি।

কেননা যখন সে ফিরে এসেছিল তার হাতে চিনাবাদামের ঠোঙ্গা ছিল।

ফিরে এসে সে আমার সঙ্গে কথা বলেনি, আমার দিকে তাকায়নি। কোণার দিকের একটা বেঞ্চির ওপর পা ঝুলিয়ে বসে বাদামভাজা খাচ্ছিল আর জানালার বাইরের বকুল গাছটা দেখছিল!

একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে সে হারিয়ে দিয়েছিল সন্দেহ কি। এই প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় নেমেছিল। রাস্তায় নেমে কি হয়েছিল জানি না।

কিন্তু বাদাম চিবোতে চিবোতে হঠাৎ উদাস চোখে বাইরের বকুল গাছের দিকে তারাচাঁদের তাকানো দেখে মনে হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তাকে ফিরতে হয়েছে।

তারাচাঁদের চেহারা দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু একটা জিনিস তারাচাঁদ কি লক্ষ্য করেছিল।

মেয়েটির শরীরের তুলনায় মুখটা যেন কচি—একটু বেশি কচি ছিল। কোন কোন মেয়ের এমন কচি মুখ থাকে—অনেকদিন পর্যন্ত থেকে যায়। তাই ওর মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল বয়স উনিশ কুড়ির মধ্যে। কিন্তু যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, বেরিয়ে যাচ্ছিল পিছনটা দেখে আমার মনে হয়েছিল পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স হওয়া আশ্চর্য না ওই মহিলার।

কে জানে তারাচাঁদ ভুল করেছিল কি সঠিক বয়স আন্দাজ করতে গিয়ে আমি ভুল করেছিলাম।

যুগভেরী কাগজের অফিসে আমার চাকরির প্রথম দিন এমন

একটা ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে কেমন যেন একটা দাগ থেকে গেল। বলতে কি আমি অনেকদিন ঐ টেবিলে বসে বকুল গাছটার দিকে তাকিয়ে থেকে সেই উজ্জ্বল শরীর, শরীরের আশ্চর্য লাবণ্য আর চোখ-ধাঁধানো রঙের ছবিটা মনে করতে চেষ্টা করতাম।

আর সে একদিনও যুগভেরী অফিসে আসেনি। অন্য কোথাও মিঃ রায়ের দেখা পেয়েছিল কিনা জানি না। মিঃ রায়কে কিন্তু আমার যুগভেরী অফিসের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলিনি। সেদিন রাত্রে ঘরে ফিরে তিনি বার বার আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন, অফিসটা কেমন লাগল, রণধীর আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করল, অন্য রিপোর্টারদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কিনা বা রিপোর্টিং সম্বন্ধে একটা মোটামুটি রকম আইডিয়া তাদের কারোর কাছ থেকে নিয়ে এসেছি কিনা ইত্যাদি।

হুঁ হ্যাঁ করে সংক্ষেপে তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়া শেষ করে আমি অন্ধকার সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবছিলাম, এটাও খুব সাধারণ ঘটনা তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু এই সাধারণ ঘটনা তুচ্ছ ঘটনাকে ফাঁপিয়ে বড় করে তুলে কি আশ্চর্য সুন্দর একটা খবর তৈরী করা যায় না।

প্রায় সমান বয়সের দুটি ছেলে একটা ঘরে বসে আছে। একটি অপরিচিত মেয়ে—মেয়ে বা মহিলা ভিতরে ঢুকল। একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলল না ভাল করে তার দিকে তাকালও না, আর একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলল তার দিকে অনেকবার তাকাল।

প্রেম না, প্রীতি না, মোহ না—তেম্‌নি ঘৃণা না, বিদ্বেষ না, উপেক্ষা না। এম্নি, অকারণে, একটু সময়ের দেখার মধ্যে দুজনের প্রতি দুরকম ব্যবহার। এটা কি রহস্য না?

সংবাদটা ফলাও করে যুগভেরীতে ছাপা যেত। অনেক রাত্ত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলাম।

॥ এগার ॥

পরদিন জোরে বৃষ্টি নামল। মিঃ রায় ভোর ছটায় অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে গেছেন। এত সকালে তাঁকে ঘুম থেকে উঠতে এই প্রথম দেখলাম, আর এই প্রথম তিনি স্নান না করে চা না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরোলেন। হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছেন। বন্ধুর আসার কথা।

এবং বলে গেলেন হয়তো সারাদিন তাঁর ঘরে ফেরা হবে না। হয়তো রাত্রেও না।

তাঁর ঘরে থাকাটা কেমন অনিশ্চিত। আমি এই দু-তিন দিনে বুঝে গেছি। কখন বেরোবেন কখন ফিরবেন তার কিছুই ঠিক নেই।

আর অন্যত্র রাত্রিবাস। কোথায় থাকেন তিনি ?

এমনি তিনি একটা ঘর নিয়ে একা আছেন। তবে কি শহরে তাঁর আত্মীয়-স্বজন আছে ? বা কোন বন্ধুর গৃহে অতিথি হন ? অথচ এসব কথা জিজ্ঞেস করা-জানতে চাওয়া আমার পক্ষে অনুচিত। আবার জানতে না পারাটাও অস্বস্তিকর। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি কলকাতায় পা দিতে না দিতে তিনি আমায় শুধু আশ্রয় দিয়েছেন বললে মিথ্যা বলা হবে—আমার যাতে কোন দিক থেকে কোন রকম অসুবিধা না হয় তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখছেন। আমার ভাত খাওয়া, টিফিন খাওয়া, জামা কাপড় পরা—আমার স্নান, চুল কাটা, রাস্তা ক্রস করার আগে ভাল করে এদিক ওদিক দেখে নেওয়ার জন্য উপদেশ দান—অর্থাৎ সব কিছু নিয়ে তিনি রীতিমত চিন্তা করছেন। আসতে না আসতে বন্ধু মোহিনীর সঙ্গে দেখা করিয়ে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। তারপর এমন চমৎকার তেতলার ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়া। কেবল থাকতে দেওয়া

কেন, অধিকাংশ সময় তিনি বাইরে থাকেন, আমার কাছে ঘরের চাবি থাকে, অতিরিক্ত একটা চাবি যদিও তাঁর সঙ্গে আছে, কিন্তু তা হলেও তিনি হাবেভাবে আমাকে বুঝতে দিচ্ছেন আমিও এ-ঘরের মালিক। অধিকার জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দায়িত্ব বাড়ে। তাই ঘর পরিচ্ছন্ন রাখতে, জায়গা মতো সব কিছু গুছিয়ে রাখতে সাজিয়ে রাখতে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করছি। আর এর জন্য আমার দুর্ভাবনারও শেষ নেই। তিনি না অসন্তুষ্ট হন, রাগ করেন।

তাই বলছিলাম, তাঁর ঘর নিয়ে যেমন আমার দুশ্চিন্তা, তাঁর মন জানতে বুঝতেও আমি ভিতরে ভিতরে কম উৎসুক না। যে মানুষ আমার জন্য এতটা করছে তাকে আমি জানব না চিনব না ? কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তাঁর প্রকৃতির একটা অংশ মাত্র তিনি আমার সামনে খুলে রেখেছেন। বাকিটা এমন ভাবে চাবিবন্ধ করে রেখেছেন যে বুঝবার চিনবার উপায় নেই।

যেমন আজ এত সকালে তাঁর হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ায় কথা আমি ভাবছি। সারাদিন, হয়তো রাত্রেও ফেরা হবে না। তিনিই বলে গেলেন।

—বন্ধুটি কে, যার জন্য তিনি স্টেশনে ছুটে গেলেন।

এই বন্ধুর সঙ্গে কি আজ সারাদিন কাটাবেন। না অন্য কোথাও যাচ্ছেন।

বাইরে বৃষ্টির জোর ক্রমেই বাড়ছিল।

ছাতা বর্ষাতি কিছুই নিয়ে বেরোননি সারদা রায়।

তিনি যখন বেরোন তখন আকাশে মেঘ ছিল। কিন্তু বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছিল কি ? ঠিক যেন মনে করতে পারছিলাম না। না কি বৃষ্টি পড়ছিল দেখেও ছাতা-বর্ষাতির কথাটা তাঁর মনে ছিল না। ছিল একটি মুখ। আর সেই মুখের কথা চিন্তা করতে এমন বিভ্রান্তের মতো বেরিয়ে গেলেন।

কে এই মানুষ। অবাক হয়ে চিন্তা করছিলাম। তিনি কি এই

প্রথম কলকাতা আসছেন। তিনি কি বরাবর কলকাতা থাকেন। বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে আসছেন। মিঃ রায়ের বন্ধুটিকেও আমার কেমন জানতে ইচ্ছা করছিল। তার বয়স কত। নাম কি। তিনিও কি মিঃ রায়ের মতো একলা একটা ঘর নিয়ে কোথাও আছেন।

উঁকি দিয়ে জানলার বাইরেটা দেখলাম। আকাশের এমন অবস্থা যে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি ধরে গিয়ে পরিষ্কার হবে মনে করতে পারছিলাম না। সোঁ সোঁ শব্দ করে হাওয়া বইছিল। কোথা থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ ছুটে আসছিল। আকাশ আগের চেয়েও অন্ধকার হয়ে গেছে। রাত্রির মতো লাগছে বাইরেটা। ঘরের ভিতর তো অনেকক্ষণ থেকে অন্ধকার হয়ে আছে। এই মাত্র আমি আলো জ্বেলে দিয়েছি। কেননা ঘড়ির কাঁটা এখন ঠিক কোথায় জানতে আমাকে আলো জ্বালতে হয়েছিল। সাড়ে আটটার কাছে এসে কাঁটা থেমে ছিল। দেখে বুকের ভিতর ঢিব করে উঠেছিল। অর্থাৎ ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়ে এই অবস্থা। দম দেওয়া হয়নি। নিশ্চয় কাল রাত দশটায় ঘড়িতে দম দিতে মিঃ রায়ের মনে ছিল না।

কে জানে, হয়তো, কাল রাত থেকেই তাঁর মাথায় হাওড়া স্টেশনের চিন্তাটা ঘুরছিল। কালও কি তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন?

তবে হয়তো তাই। আমার সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন পুরো মনটা আমার দিকে ছিল না। না, আমি তো তাঁর মনের একটুখানি অংশ দেখছি। এই মাত্র সেই কথাই চিন্তা করছিলাম। তিনি সর্বদাই অন্যমনস্ক। সর্বদাই মনের আর একটা দিক ঢেকে রাখছেন। তাঁর আর একটা জীবন আমার দেখা শোনা অনুভাবনার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

টেলিফোন বেজে উঠল।

একটু ভয় পেলাম।

টেলিফোনে কথা বলা আমার অভ্যাস নেই।

রিসিভারটা তুলতে গিয়ে হাতটা কাঁপছিল। তা হলেও তুললাম। এই প্রথম তিনি ঘরে নেই—এই অবস্থায় টেলিফোনে কে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

আমাকেই কথা বলতে হবে।

তিনি ঘরে নেই অন্তত এ খবরটুকু টেলিফোনের ভিতর দিয়ে আর এক জনকে জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। কর্তব্যবোধ থেকে আমি রিসিভার তুললাম।

'হ্যালো।'

'মিঃ রায় ?'

'না।'

'কে আপনি ?'

মুহূর্তকাল চিন্তা করলাম।

'আমি······আমি এখানে আছি, মিঃ রায়ের সঙ্গে আছি। তিনি ঘরে নেই।'

'কোথায়! বাথরুমে বুঝি ?'

'না।'

'নীচে চা খেতে গেছেন ?'

'না, নীচে যাবেন কি—এখন এখানে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে। আপনি যেখান থেকে কথা বলেছেন সেখানে কি—'

'না, এখানে বৃষ্টি নেই। পরিষ্কার আকাশ। রোদ উঠেছে। পাখি ডাকছে।'

পাখির ডাকের মতো মিষ্টি নরম ঠাণ্ডা গলার স্বর। আমার এত ভাল লাগল।

'এখানে মনে হচ্ছে রাত। তেমনি অন্ধকার। আমি ঘরে আলো জ্বেলে দিয়েছি।'

'বেশ করেছেন। মিঃ রায় কি রাত্রে ঘরে ছিলেন না?'

'হ্যাঁ, ছিলেন, হাওড়া স্টেশনে গেছেন।'

'কখন?'

'ছটায় বেরিয়ে গেছেন। চা না খেয়ে ছুটে গেছেন—কে তাঁর এক বন্ধু আসবে।'

'আশ্চর্য।'

'তিনি ফিরে এলে কি কিছু বলব? আপনি কি—

ওপার নীরব।

'হ্যালো, হ্যালো—' আমার গলার স্বরটা নিজের কাছে কেমন চিৎকারের মতো লাগল। যেন টেলিফোনের মধ্য দিয়ে আমার চিৎকার আমার কানে ফিরে এল। বুঝলাম ওদিকে টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছে। কথা বলতে আর কেউ নেই। রিসিভার নামিয়ে রেখে ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটা মুখ ভেসে উঠল। মুখের সঙ্গে সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল রং, অপরূপ চুল। কাল যুগভেরী অফিসে মিঃ রায়ের খোঁজে যে এসেছিল সে কি! নিশ্চয় কোথাও থেকে টেলিফোন করে আজ আবার মিঃ রায়কে খুঁজছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটা নাম মনে পড়ে গেল। মীরা। মিঃ রায় যার সঙ্গে পরশু এবং কাল কথা বলছিলেন। সেই মেয়ে? মেয়ে কি মহিলা জানি না যদিও।

যদি সেই মেয়ে না হয় তবে আর কে হতে পারে! আর কেউ হতে পারে কিনা চিন্তাটা আমার মাথায় এমনভাবে ঘুরতে আরম্ভ করল যে এক সময় মাথায় যন্ত্রণা আরম্ভ হল।

যেন সারদা রায়ের জীবনের অনেক কিছুই জানছি না বলে যন্ত্রণা অশান্তি ক্ষোভ। তিনি যদি আমায় এমন আপন করে না নিতেন তবে বোধ হয় যন্ত্রণা থাকত না।

॥ বারো ॥

বেলা দশটায় বৃষ্টি ধরল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠল। আর সমস্ত শহর যেন নতুন করে চঞ্চল হয়ে উঠল, অশান্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু চঞ্চলতা মানুষের ঘর বাড়ির ছাদ বারান্দা জানালা পর্যন্ত ছড়িয়ে রইল—রাস্তায় চঞ্চলতা নেই। রাস্তার অন্যরকম চেহারা। এত জল দাঁড়িয়ে নদীর মতো দেখাচ্ছে। নদীর যদি কোন চঞ্চলতা থাকে শব্দ থাকে অস্থিরতা থাকে তবে এখন শহরের এত বড় রাস্তার দিকে তাকালেও সেই রূপ চোখে পড়বে, সেই শব্দ শোনা যাবে। জলে ঢেউ উঠছে। পেভ্‌মেন্ট ছাপিয়ে একতলার বাড়ির দরজা পর্যন্ত জল ছুটে ছুটে আসছে। বাস চলছে না, ট্রাম চলছে না, ট্যাক্সি লরী রিক্সা অদৃশ্য হয়েছে। ছেঁড়া কাগজ খড়-কুটো তুলো শালপাতা কত কি ভাসছে। দুটো ছেলে মহানন্দে সাঁতার কাটছে। আর বারান্দার ছাদে জানলায় দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষ সেই দৃশ্য দেখছে, কলরব করছে। যারা অফিসে যাবে তারা যেতে না পেরে একসঙ্গে আক্ষেপ ও উল্লাসধ্বনি করছে। বাজারে যেতে না পেরে কিছু মানুষ ছটফট করছে আর কর্পোরেশনের নর্দমার জল নিকাশের অব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করছে। যাদের কোথাও যাবার তাড়া নেই, বেরোবার গরজ নেই তারা চীৎকার করে গান গাইছে, শিস দিচ্ছে এবং কোন রকমে তেলেভাজার দোকান থেকে গরম গরম বেগুনি ফুলুরি আনিয়ে নেওয়া যায় কিনা তাই নিয়ে গবেষণা করছে।

তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কলকাতার রাস্তা ও রাস্তার জল দেখলাম। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা গেল। কাতারে কাতারে মানুষ দুধারের বারান্দায় ছাদে দাঁড়িয়ে জল সরতে আরম্ভ করেছে কিনা লক্ষ্য করছে।

কোমর জল, কোথাও যেন গলা জলে নেমে কর্পোরেশনের লোকটা রাস্তার মাঝখানের বড় ড্রেনের মুখের ঢাকনাগুলি সরিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। কিন্তু তাতেও খুব একটা সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এত জল কি আর হুস্ করে কোন পাইপ দিয়ে গলে যেতে পারে ?

'এখানে জল দেখছেন কি মশাই—কালীতলায় গিয়ে দেখুন অবস্থা—' কে যেন বলছিল, 'ওখানে ওরা নৌকা গামলা ভাসিয়ে দিয়েছে। বাজার সওদা আছে রান্না-বান্না আছে তো—কতক্ষণ আর উপোস থাকবে ?'

সেদিন শহরের রাস্তার জলের বর্ণনা দিয়ে একটা বেশ বড় খবর তৈরী করে যুগভেরীর নিউজ এডিটারের কাছে নিয়ে গেলাম। খবরটা দেখে রণধীরবাবু খুশি হলেন। দু'এক জায়গায় অবশ্য একটু আধটু কেটে ছেঁটে সংশোধন করে দিলেন। আর বললেন, 'হু' এভাবে আস্তে আস্তে হাত আসবে—অত্যন্ত জরুরী খবর—অন্তত কলকাতার লোকের পক্ষে। সব কাগজেই কলকাতার রাস্তায় জল দাঁড়াবার প্রবলেম নিয়ে কিছু না কিছু এডিটরিয়েল কলমে লেখা থাকবেই। তা আপনার প্রথম দিনের রিপোর্টিং ভালই হয়েছে—আস্তে আস্তে হাত আসবে।' আস্তে আস্তে হাত আসার কথাটা তিনি দুবার বলেছিলেন। তা তো বটেই। যুগভেরী কাগজে এমন লোক আছেন, এমন ঝানু রিপোর্টার আছেন যাঁরা এক নাগাড়ে কুড়ি বছর পঁচিশ বছর ধরে এই কাজ করছেন। একটা কাগজ না, এক ডজন কাগজে ঘুরে ঘুরে কাজ করেছেন তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তাঁরা অনেক কাগজ ভূমিষ্ঠ হতে দেখেছেন, বড় হতে দেখেছেন, আবার অপমৃত্যুও দেখেছেন কত কাগজের।

'আবার কত কাগজকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়ে হাত-পা ধুয়ে রাতারাতি গিয়ে আর এক কাগজের অফিসে বাসর পেতেছি হি-হি-।'

রণধীরবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে সরু বারান্দা পার হয়ে রিপোর্টারদের সেই অন্ধকার অন্ধকার বিদঘুটে চেহারার ঘরটায় আমি পা দিতে না দিতে একটা চমৎকার উক্তি শুনতে পেলাম। আমি নতুন, কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই হয়নি। কোণার দিকের একটা চেয়ার লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে বসলাম।

আজ আর ঘরটা ফাঁকা না।

আলো জ্বলছে।

মাঝখানের বড় টেবিলটায় গোল হয়ে তাঁরা বসেছেন।

যুগভেরীর রিপোর্টারদের সকলকে আমি সেদিন ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম।

আসরের মধ্যমণি সিদ্ধেশ্বরবাবু। নাকে পুরু লেন্সএর চশমা। ডাঁট দুটো অসম্ভব মোটা। তাতে কিছু খারাপ দেখায় না। সিদ্ধেশ্বরবাবুর মাথাটা খুব বড়। সেই অনুপাতে মেদ-মাংস নিয়ে ঘাড়টাও বিশাল। তাঁর মাথায় টাক। কিন্তু আঙুলের গিঁঠে গিঁঠে প্রচুর কাঁচা পাকা চুল। বোঝা গেল তিনি সবচেয়ে রসিক। তিনিই বেশি কথা বলছিলেন।

একটা কাগজকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়ে রাতারাতি গিয়ে আর একটা কাগজের অফিসে বাসর পাতার চমৎকার গল্পটা বলা শেষ করতে সকলে হো-হো করে হেসে উঠল এবং পুরস্কার স্বরূপ চার-পাঁচটা সিগারেটের বাক্স সিদ্ধেশ্বরের নাকের সামনে আন্দোলিত হতে লাগল। হঠাৎ এতগুলি সিগারেটের বাক্স দেখে সিদ্ধেশ্বরবাবু যেন ঘাবড়ে গেলেন। অবশ্য তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বাক্সের সাদা নীল লাল ও হলুদ রং বিচার করে পরে তাঁর মনোমত বাক্স থেকে একটি মাত্র সিগারেট তুলে নিলেন।

ইতিমধ্যে এত বড় ঠোঙ্গায় করে মুড়ি ও তেলেভাজা চলে এল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরাচাঁদ বেয়ারাই মুড়ি তেলেভাজা নিয়ে এল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখটা নামিয়ে নিল। আমি মনে

মনে হাসলাম।

হয়তো তারাচাঁদ ভাবছিল, কাল একজন এত বেশি চুপ থেকে গম্ভীর থেকে আমাকেই জিতিয়ে দিয়ে গেল, আর এতগুলি কথা তার সঙ্গে বলে তাকেই হারিয়ে দিয়ে গেল!

'কি মশাই, আপনি চুপচাপ একলা কোণায় বসে কেন—আসুন আসুন।' হাত তুলে একজন আমায় ডাকল আর সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন আমার দিকে চোখ ঘোরাল।

'আহা, নতুন চাকরি বলে কি নতুন বৌ হয়ে থাকবেন?' রসিক সিদ্ধেশ্বরবাবুও মোটা ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় দেখছে. 'আসুন, এসে হাত চালান।'

টেবিলে বাসি যুগভেরী বিছিয়ে ঠোঙ্গার মুড়ি তেলেভাজা ঢেলে দেওয়া হয়েছে আর সবাই হাত ও মুখ একসঙ্গে চালাতে আরম্ভ করেছে।

'মশাই, এর নাম কাগজের অফিস। কাগজের অফিসে কাজ করা আর বেশ্যার খাতায় নাম লেখানো এক কথা, আজ এখানে কাল সেখানে। তাই মশাই, বেহায়া হয়ে আলাপ-পরিচয়টা আগে ভাগে করে রাখতে হয়। আখেরে কাজ দেয়।'

'বটেই তো বটেই তো। খেলার রিপোর্টার হারানবাবু মুড়ির ভিতর থেকে সযত্নে একটা কাঁচা লঙ্কা তুলে কামড় বসান ও চোখ-মুখ কুঁচকে সিদ্ধেশ্বরের কথায় সায় দেন। 'কদিন আর নবভারতে কাজ করেছিলাম? দাদার সঙ্গে পরিচয় ছিল বলেই না নবভারত পটল তুলতে দৈনিক গণভারত থেকে টেলিফোন করে জানাল, এখানে চলে এসো—উপোস থাকতে হবে না। নবভারতের এশিয়াটিক কলেরা হয়েছিল, মারা গেল—গণভারত গনোরিয়ায় ভুগলেও মরবে না, কোন রকমে টিঁকে থাকবে—কেমন, রাত বারোটায় টেলিফোনে ঐ কথাটি জানিয়ে দিয়েছিলে না তুমি সিদ্ধেশ্বরদা?'

সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। আমায়ও হাসতে হল। তেলেভাজা ও মুড়ি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উড়ে গেল। পুরোনো যুগভেরীর শিটখানা ফ্যানের হাওয়ায় পত পত করে উড়তে লাগল। এতক্ষণ পাখা বন্ধ ছিল মুড়ি উড়ে যাবে ভয়ে। এখন পাখা খুলে দিতে কাগজটা উড়তে লাগল।

'তা, শুনলাম নিউজ এডিটার বলছিল, প্রথম দিনই চমৎকার নিউজ তৈরী করে দিয়েছেন?' একজন প্রশ্ন করতে বাকী চারজন আমায় ছেঁকে ধরলেন।

'বটে—কিসের ওপর নিউজ দাদা?'

'আজ সকালে জোর বৃষ্টি হয়ে গেল তো—আমাদের পাড়ার রাস্তায় এত জল দাঁড়িয়েছিল। তাই নিয়ে একটা খবর।' আস্তে, কেমন যেন ভয়ে ভয়ে কথাটা বললাম।

শুনে সবাই চুপ করে রইলেন। দুজন সিগারেট ধরালেন। একজন নস্যির টিপ নিলেন। আর একজন চেহারাটা বিকৃত করে টেবিলে আঙুল ঠুকতে লাগলেন। সিদ্ধেশ্বরবাবু হঠাৎ একটা বড় রকমের হাই তুললেন। প্রথমটায় মনে করেছিলাম আমার কথার ওপর তিনি কথা বলতে মুখ খুলছেন। কিন্তু দেখলাম তিনিও হাই তুললেন ও পরে মুখটা কালো করে চুপ থেকে গেলেন।

অর্থাৎ আমার খবর শুনে সবাই মুষড়ে পড়েছেন। বৃষ্টি বা রাস্তার জল না, তারা চমকপ্রদ চাঞ্চল্যকর কোন সংবাদ আশা করেছিলেন, অনুমান করলাম।

'বুঝেছেন মশাই' রোগা পাঁশুটে চেহারার মানুষটি, নাম যেন খগেনবাবু, শহরের খুন রাহাজানি নারীহরণ আইন আদালতের খবর যোগাড় করতে তাঁর জুড়ি কলকাতা শহরে নেই, পরে জেনেছিলাম, হাতের বুড়ো আঙুলটা আমার চোখের সামনে নাচিয়ে বললেন, 'যদি মোহিনীর কাগজে আদৌ টিকে থাকবার বাসনা আপনার থেকে থাকে তো জল বৃষ্টি সাপ ব্যাং-এর খবর বয়ে এনে সেই বাসনা

আপনার পূর্ণ হবে না—হুঁ আগে থাকতেই সাবধান করে দিচ্ছি। কি বলেন সিদ্ধেশ্বরদা।'

সিদ্ধেশ্বর আগের মতো নীরব থেকে টাকে হাত বুলোতে থাকেন।

'নারীঘটিত খবর—মেয়েমানুষ সংক্রান্ত রসালো রসালো খবর আপনাকে খুঁজে পেতে আনতে হবে।' হারানবাবু বুড়ো আঙুল নাচালেন না, মৃদুমন্দ হেসে আমায় সদুপদেশটি দিলেন।

আর একজন, আবলুশের মতো কালো গায়ের রং—অথচ পরণে দুধের মতো সাদা ধবধবে খদ্দর, নাম অলকবাবু, এসেম্বলি কাউন্সিলের খবর টুকে আনেন, গলার স্বরটাও কেমন খসখসে, আমার চোখে চোখ রেখে ভুরু নাচিয়ে বললেন 'মশাই, রাতদিন খুব করে শহরের অলিগলিতে ঘুরবেন, ঘুরতে ঘুরতে পারেন তো ওদের পাড়ায় চলে যাবেন—বেশ নরম খবর চুটকি খবর—সব রকম খবরই যোগাড় করতে পারবেন।'

খুন রাহাজানির রিপোর্টার খগেনবাবু একটা চোখ ছোট করে ফেললেন।

'ওদের পাড়া বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন ভাল করে এঁকে বুঝিয়ে দিন।'

এসেম্বলির অলকবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আহা, যদি তিনি আ বলতে আনারস না বোঝেন, কা বলতে কাক না বোঝেন তো তাঁর খবরের কাগজে কাজ করতে আসার মানে হয় কিছু?' অলকবাবু আমার চোখের দিকে তাকালেন। 'কি মশাই, বুঝিয়ে দিতে হবে? ওদের পাড়া মানে ব্রথেল, হাফ্-গেরস্থও ধরে নিতে পারেন জায়গা বিশেষে। অ—নে—ক রসের খবরের সন্ধান পাবেন।'

'উহুঁ।' এতক্ষণ পর ঘাড়মোটা সিদ্ধেশ্বর মুখ খুললেন, টাক থেকে হাত সরালেন। 'এখনি থেকেই যদি তিনি অত রস আমদানি

করতে শুরু করেন তো মোহিনী তাঁর গা চাটতে শুরু করবে। তার মানে কেবল রসের খবর না, তাঁর গায়ের চামড়া চুষে চিনি বার করতে পারা যায় কিনা মোহিনী সেই চেষ্টা করবে। ক্যাপিট্যালিস্ট কথাটার অর্থ কি?'

হঠাৎ সবাই চুপ করে গেল।

'ঐ, আপনি যা করে যাচ্ছেন তাই করে যান, যা দিতে শুরু করেছেন তাই দিয়ে যান মশাই, বৃষ্টি জল সাপ ব্যাং ছুঁচো বাঁদরের খবর। এখন চিনি মধু ছড়াবেন না। পরে হালে পানি পাবেন না। মধুর জন্য মোহিনী আপনার হাড় চুষতে সুরু করে দেবে।' সিদ্ধেশ্বর আবার টাকে হাত তুলে দেন।

'কিন্তু আর একজন, মোহিনীর সাকরেদটি?' খগেনবাবু মাথা নাড়লেন। 'যুগভেরীর জন্য মেয়েমানুষের খবর যোগাড় করতে না পারলে সারদা কালই মোহিনীকে কানমন্ত্র দেবে, ভায়ার আমাদের এখানে পরশু থেকে আর চাকরি করা হবে না।'

অলকবাবু মাথা নাড়লেন।

'মোহিনীকে সাপ ব্যাং দিয়ে ভোলানো যাবে—কিন্তু মিঃ রায় ওসবে ভুলবেন না।'

হারাণবাবু ভুরু নাচালেন।

'সাধে কি আর নারীহরণ নারীধর্ষণের দিকে আমার এত ঝোঁক? সারদা রায় ওসব খবর পেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়। শুনেছি বৌ মরেছে পর থেকে ব্যাটা নাকি পাগলা কুকুরের মতন মেয়ের পিছনে ঘুরছে। হুঁ, রাস্তায় সুন্দর মেয়ে দেখলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, দরকার হলে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ে পিছনে ধাওয়া করে।'

'কেবল পিছনে ধাওয়া কেন। যুগভেরী কাগজে এই দু বছরে যত মেয়ে আমদানি করা হয়েছে শহরের আর কোন্ খবরের কাগজে এত মেয়ে চাকরি করছে তুমিই একবার বলো সিদ্ধেশ্বরদা। সিদ্ধেশ্বরের দিকে সিগারেটের বাক্সটা বাড়িয়ে দেন অলকবাবু। 'সব ঐ মিঃ

রায়ের পরামর্শে। টেলিফোন বোর্ডে কাল একটিকে নেয়া হয়েছে। পরশু থেকে জয়েন করবে, তোমাদের সকলকে জানিয়ে রাখছি। তিনজন মেয়ে সাব-এডিটার আছে তোমরা জান। শুনছি ডেসপ্যাচে একাউন্টসেও আরো দুটি নেয়া হচ্ছে। আর, আর আমাদের রিপোর্টার মলয়া চক্রবর্তী তো আছেনই।'

আমি এদিক ওদিক তাকালাম।

এই প্রথম শুনলাম যুগভেরী কাগজে মেয়ে রিপোর্টার আছে।

মলয়া কখন আসেন, কোন চেয়ারটায় বসেন, তাঁকে কোথায় খবর আনতে পাঠানো হয় জানতে কৌতূহল হচ্ছিল।

কিন্তু আমার এই কৌতূহল চরিতার্থ করতে পুরুষ রিপোর্টাররা মলয়ার কথা তোলেন নি। তাঁরা মোহিনীর কথা—মোহিনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু সারদা রায়ের কথা নিয়ে মেতে আছেন।

'কেবল মেয়ে?' সুন্দর চেহারার ছেলেরাও আজকাল যুগভেরীতে চট্ করে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে।

'এই যেমন আমাদের দাদা।' হারানবাবু সরাসরি আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হাসেন। সিদ্ধেশ্বরবাবু, অলকবাবু, খগেনবাবু —সকলেই হাসেন। দূরে একটা বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে বসে তারাচাঁদ চিনাবাদাম খাচ্ছিল। আমার দিকে চোখ ঘুরিয়ে সেও একবার ঠোঁট টিপে হাসল। আমি তার দিকে চোখ তুলতে সে চট করে চোখটা বকুল গাছের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

ভীষণ রাগ হচ্ছিল বেয়ারাটার ওপর—আর এদের কথাবার্তা শুনে আমি ঠিক রাগ করতে পারছিলাম না বিরক্ত হতে পারছিলাম না যেমন, তেমনি খুব একটা উল্লসিত হয়ে ওঠাও সম্ভব হচ্ছিল না। চুপ করে শুনছিলাম। যদি মেয়ে হতাম চেহারার কথায় হয়তো কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠতাম। ঘাড় গুঁজে থাকতাম।

'দাদার কি সিগারেট অভ্যাস আছে?' অলকবাবু প্রশ্ন করলেন। আমি ঘাড় নাড়লাম।

'তবে কি তুমি বলছ, বেছে বেছে আজকাল সুন্দর চেহারার ছেলেদের যুগভেরীতে নেয়া হচ্ছে টোপ হিসেবে।' সিদ্ধেশ্বর হারানের দিকে চোখ ফেরাল। 'সুন্দর চেহারার মেয়ে এসে যাতে যুগভেরী অফিসে ভিড় করে ?'

'তাছাড়া কি !' হারান টেবিলে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বলল, 'রকম সকম দেখে তাই মনে হচ্ছে—আমাদের দানা ফুরিয়ে এসেছে মোহিনীর কাগজে—লাল মুখ ছেলে আর গোলাপী মুখ মেয়ে ছাড়া কেউ থাকবে না এখানে। আর এসবের মূলে রয়েছে সারদা রায়। বৌ মরেছে পর থেকে ব্যাটা যেন ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো—'

'আচ্ছা, যুগভেরীর সঙ্গে সারদা রায়ের সম্পর্ক কি—সে কি মোহিনীর পার্টনার ?' অলকবাবু প্রশ্ন করতে সিদ্ধেশ্বরবাবু সেদিকে চোখ ফেরালেন।

'পার্টনার কিনা জানি না। তবে মোহিনীর বন্ধু গাইড অ্যাডভাইজার—সব কিছু বলতে ঐ সারদা রায়। শুনেছি মাথাটা খুব পরিষ্কার। খবরের কাগজ জিনিসটা খুব ভাল বোঝে। যুগভেরী আগে দু পয়সা দামের একটা শিট হয়ে শনিবার শনিবার বেরোত। ঐ সারদা রায় এসে একদিন জুটল মোহিনীর সঙ্গে—তাই আজ যুগভেরী এ ক্লাশ ডেইলী।'

নীচে গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

তারাচাঁদ জানালা দিয়ে উঁকি দিল। তারপর জানালা থেকে তড়াক করে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে ছিটকে এসে বড় টেবিলটার সামনে দাঁড়াল। আর ভুরু দুটো কপালে তুলে হিস-হিস শব্দ করে উঠল, 'মোহিনীবাবু, মোহিনীবাবু।'

ঘরের ভিতরটা যেন হিম হয়ে গেল।

॥ তেরো ॥

অনেক ঘুরলাম সেদিন। যুগভেরী অফিস থেকে রাত আটটায় বেরিয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ হাঁটলাম।

একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম।

অপরিচিত দোকান। অপরিচিত মুখ সব।

আমার ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমি এখন এই শহরের মানুষ। আস্তে আস্তে সব আমার পরিচিত হয়ে উঠবে। হঠাৎ পরেশের সেই ছোট দোকানটার কথা মনে পড়ল। এত ভিড় এত আলো এখানে—পরেশের চায়ের দোকানটাকে মনে হচ্ছিল একটা খেলাঘর। আর কাপ ডিশ কেটলি দুটো চেয়ার ও একটি মাত্র বেঞ্চির খেলনা সাজিয়ে ছোট ছেলেটির মত চুপ করে যেন পরেশ বসে আছে। একটা মেয়ে আমায় চা দিল। আমার চোখে চোখ রেখে মিষ্টি একটু হাসল।

'আর কিছু নেবেন না ?'

'একটা কেক।'

আর একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে ও চলে গেল এবং এক মিনিট পর কেক নিয়ে ফিরে এল।

আমার যেন কেমন জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল মেয়েটি কদিন এই দোকানে চাকরি করছে, কোথায় থাকে, আর কে আছে ওর। শ্যামলা রং। টানা ভুরু। তেমন সুন্দর না হলেও চেহারাটা ঠাণ্ডা।

এই মেয়েটির জীবনে এমন কিছু কি ঘটবে যা একটা খবর হয়ে যুগভেরী কাগজে ছাপা হতে পারে। রিপোর্টার হারানবাবুর কথা মনে পড়ল। নারী হরণ নারী ধর্ষণের খবর টবরের দিকে মোহিনীর ভয়ানক ঝোঁক। চা খেতে খেতে খগেনবাবু অলকবাবু হারানবাবু

সিদ্ধেশ্বরবাবুদের আলোচনাটা চিন্তা করছিলাম। বেশ্যাপাড়ায় খুব করে ঘুরবেন মশাই, হাফ-গেরস্ত মেয়েমানুষদের পাড়ায় যাবেন। অনেক মজার খবর কুঁড়িয়ে কাড়িয়ে আনতে পারবেন।

নিয়ন আলোর দিকে চোখ রেখে ভাবছিলাম। সেসব পাড়া কোথায় কে জানে। হাফ-গেরস্ত বলতে কাদের বোঝায় তাই বা আমায় কে বলে দেবে।

'আর কিছু নেবেন ?'

আমি মাথা নাড়লাম। আর একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে মেয়েটি চলে গেল ও একটু পর বিল নিয়ে এল।

চা ও কেক-এর দামের ওপর অতিরিক্ত একটা দশ নয়া ওকে বকশিশ দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

আবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

বড় রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। বড় রাস্তায় আলো বেশি, মানুষ বেশি। চলতে চলতে হঠাৎ ডাইনে বাঁয়ে এক একটা গলি দেখে থমকে দাঁড়াচ্ছিলাম। কেমন যেন অন্ধকার হাঁ নিয়ে এক একটা গলি চুপ করে শুয়ে আছে।

আমার মনে হচ্ছিল যদি ঐ অন্ধকার একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ি তা হলে অনেক খবর যোগাড় করে আনতে পারব। কলকাতা শহরের যত রহস্য রোমাঞ্চ—যত আজগুবি ঘটনা মজাদার খবর এই গলিগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে।

একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে আমার গা সিরসির করছিল। যেন অন্ধকার অরণ্যে প্রকাণ্ড সরীসৃপ হাঁ করে আছে।

কলকাতার বড় রাস্তার অজস্র আলো ও কলরবের পাশে রহস্যের অন্ধকারে ঠাসা গলিঘুঁজি দেখে আমার আধা-শহর আধা-পাড়াগাঁ শ্যামনগরের ছবিটা মনে পড়ল। সেখানে আলো ও অন্ধকার এমন পাশাপাশি জেগে নেই। যখন আলো তখন সব আলো, যখন অন্ধকার তখন সবই অন্ধকার। দিন ও রাত্রি—এই দুটো সত্য

ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। হেঁয়ালী ও অস্পষ্টতা নেই বলে শ্যামনগরকে এত ভালবেসেছিলাম।

আজ সেই শ্যামনগর কত পিছনে ফেলে এসেছি।

ঘরে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল।

আলো দেখে বুঝলাম মিঃ রায় ফিরে এসেছেন।

আশ্বস্ত হলাম। আজ রাত্রে ফিরবেন না বলে ধরে রেখেছিলাম। তিনিও সকালে এমন আভাস দিয়েছিলেন।

'কোথায় ছিলে? অনেক রাত করে ফেললে দেখছি।'

'ঘুরেটুরে একটু দেখলাম।'

মিঃ রায় মৃদু হাসলেন।

'কাগজের রিপোর্টার হয়েছ যখন ঘুরেটুরে দেখতে হবে বৈ কি! শহরটাকে ভাল করে চিনতে হবে।'

কিন্তু মিঃ রায়কে কেমন যেন ক্লান্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। পরনে গেঞ্জি লুঙ্গি। যেন স্নান করেননি আজ। তাঁর এমন সুন্দর চুল রুক্ষ এলোমেলো হয়ে আছে।

'তুমি কি হোটেল থেকে খেয়ে এসেছ?'

'না।' সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, তিনি খেয়ে এসেছেন কিনা। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি ঘাড় তুলে আলোটা দেখছিলেন। ভুরু ও কপাল কুঁচকে এমন ভাবে সেদিকে তাকালেন, দেখে মনে হল আলোটা তাঁর ভাল লাগছে না।

'আপনার খাওয়া হয়েছে?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

'না, হ্যাঁ ভাত খাইনি। সাকুরায় ঢুকে চা টোস্ট খেয়ে এসেছি।'

কিছু একটা অনুমান করলাম। কেননা আলোর দিক থেকে চোখ নামিয়ে তিনি কপালের রগ দুটো দু আঙুলে টিপে ধরলেন।

'আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন?' ভয়ে ভয়ে আর একবার প্রশ্ন করলাম। কপাল থেকে আঙুল সরিয়ে তিনি আমার চোখ

দেখলেন। হাসলেন! ক্লান্ত বিমর্ষ হাসি।

'মাথাটা ধরেছে।'

'এ্যাসপ্রো এনে দেব—সাকুরার পাশে বড় ওষুধের দোকানটা আজ আমি দেখেছি। পাঁচ মিনিট লাগবে আমার যেতে আসতে।'

'না না, কিস্সু দরকার নেই, ও এমনি, এমনি সেরে যাবে। একটু বেশি ঘোরাঘুরি করেছি, তাই।'

চুপ করে তাঁকে দেখছিলুম।

ইচ্ছা হচ্ছিল জিজ্ঞেস করি কোথায় এত ঘুরেছেন, যে-বন্ধুটির আসবার কথা ছিল সকালের ট্রেনে তিনি এসেছেন কিনা, যদি এসে থাকেন তিনি কোথায় আছেন।

'তুমি নিচে খেতে যাবার আগে আলোটা নিবিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ এখনি যাচ্ছি, এখনি আলো নিবিয়ে দেব।' ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আলোটা চোখে লাগছে তাঁর, বুঝতে পেরে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম।

'না না, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই—জামা—কাপড় ছেড়ে তুমি—স্নান করবে কি, রাত্রে তোমার স্নানের অভ্যাস নেই—বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে এসো—তারপর যখন বেরোবে তখন আলো নিবিয়ে দিলে চলবে।'

হয়তো আলো নিবিয়ে তিনি শুয়ে ছিলেন। নিশ্চয় শরীর ভাল লাগছিল না। দশটা বেজে গেল, আমি ফিরছি না দেখে ব্যস্ত হয়ে আবার উঠে বসেছেন। আলো জ্বেলে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

কথাটা চিন্তা করে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল।

আমি এখানে আছি বলে তাঁকে এই অসুবিধা—কে জানে, হয়তো আরো নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। অথচ তিনি ঘুণাক্ষরেও নিজের অসুবিধা অস্বস্তির কথা আমার কাছে প্রকাশ করবেন না।

যত দেখছি মানুষটাকে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

হোটেলে খেতে বসে খগেনবাবুদের কথাগুলি চিন্তা করলাম।

কিন্তু তারা মিঃ রায়ের যে চিত্র আমার সামনে তখন তুলে ধরল তাতে আমি অবাক হইনি। কেননা এটা তাদের স্বভাব। যেহেতু মোহিনীবাবুর কাগজে তারা চাকরি করছে সেইজন্য উঠতে বসতে তারা মোহিনীবাবুর নিন্দা করবে। গ্যাঞ্জেস হোসিয়ারী মিলের কর্মচারীদের মধ্যেও এটা আমি লক্ষ্য করতাম। রোজ একবার করে ম্যানেজার বড়বাবুর মুণ্ডপাত না করলে তাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হত না। এখানেও তাই। মোহিনীবাবুর নিন্দা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধু মিঃ রায়ের চরিত্রের প্রতি বিশ্রী ইঙ্গিত।

যুগভেরী কাগজে তিনি মেয়েদের চাকরি দিচ্ছেন। এটাই তাঁর অপরাধ? আজকাল তো অনেক অফিসে দোকানে মেয়েরা চাকরি করছে। মেয়েরা এখন লেখাপড়া শিখছে, বাইরে বেরোচ্ছে। তার ওপর দুর্মূল্যের বাজার। ঘরে ঘরে অভাব-অনটন লেগে আছে। ছেলের রোজগারে কুলোয় না। মেয়েকেও চাকরি করতে হচ্ছে। হয়তো এমন সংসার আছে যেখানে একটাও ছেলে নেই। মেয়ে আছে। বুড়ো বাপ-মা উপোস থাকছে দেখে মেয়ে টাকা আনতে বাইরে বেরোচ্ছে। উপায় কি?

মিঃ রায় বেছে বেছে সুন্দর চেহারার ছেলেদের যুগভেরী কাগজের অফিসে বসিয়ে দিচ্ছেন।

এটাও বাজে কথা।

কেননা দুদিন অফিসে থেকে আমি দেখেছি সব ছেলেই তেমন কিছু দেখতে ভাল না। মিঃ রায় অবশ্য প্রথম দিন আমায় বলেছিলেন, মোহিনীবাবু আমার চেহারা দেখে খুশি হবেন, চাকরি প্রার্থীর অন্যান্য গুণের মধ্যে চেহারাটাকেও তিনি গণ্য করেন। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং চট্ করে আমার কাজটা হয়ে যাওয়ার জন্য রিপোর্টারের দল ঈর্ষায়

এসব বলাবলি করছিল। অনেকটা আমাকে আক্রমণ করতেই যে কথাগুলি বলছিল বেশ বোঝা গেছে। বিশেষত আমি মিঃ রায়ের লোক—আমার সামনে তাঁর নিন্দা করার সুযোগটা তারা পুরোপুরি নিয়েছে। তাছাড়া আমি নতুন লোক। মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারব না। তর্ক করতে পারব না।

• কিন্তু হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে অন্য দু-একটা চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মিঃ রায়ের স্ত্রী ছিলেন। তিনি মারা গেছেন। খগেনবাবুদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে দু-তিন বছর হয় স্ত্রী মারা গেছেন। তবে কি মিঃ রায় নিঃসন্তান! তাই হবে। ছেলেমেয়ে থাকলে তিনি এমন একলা থাকতেন না।

একটা জিনিস আমার নিকট এখন পরিষ্কার হয়ে গেল। মিঃ রায়ের আপনার বলতে কেউ নেই। যেমন আমি। বাবা-মা মারা গেছে। এক দিদি আছে। তার সঙ্গেও আর যোগাযোগ নেই। সংসারে যারা এমন একলা মানুষ তারা একদিক থেকে বড় অসহায়। এই অসহায়তাই একটি মানুষকে আর একটি মানুষের কাছে টেনে নেয়—আপন করে নিতে চায়। মিঃ রায় আমাকে আপন জনের মতো পেতে চাইছেন না কি।

কথাটা মনে হতে চোখ দুটো কেমন ছলছল করে উঠল। সাকুরা রেস্টুরেন্টের পাশের ডিস্পেন্সারী থেকে দুটো এ্যাসপ্রোর বড়ি কিনে নিলাম। ডিস্পেন্সারীর ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে।

॥ চৌদ্দ ॥

বাড়ির সদরের কাছে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করছিল। তারা হাঁ করে রাস্তায় ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। মোড়ের ওদিক থেকে দু-তিন জন 'মার শালাকে' 'মার শালাকে' বলতে বলতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে।

কেমন ভয় করছিল।

এক পা এক পা করে এগোতে লাগলাম। দু-তিনজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কি বলাবলি করছিল। সেখানে একটু দাঁড়ালা । কথাগুলি শুনলাম। কিন্তু কিছু বোঝা গেল না।

'আর মারবে কাকে—শালা পালিয়ে গেছে।' একজন বলছিল। বলে হাসছিল।

'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও—রোজই এমন দু-চারটে করে যাচ্ছে।'

'একেবারে গেছে কি?'

'মাথাটা গুঁড়িয়ে গেছে—'

আরো দু পা অগ্রসর হলাম।

তখন ব্যাপারটা বুঝলাম।

একটা ট্যাক্সি আসছিল ডান দিক থেকে। রাস্তার ওপারের খাবার দোকান থেকে জিনিস কিনে একটা ন' দশ বছরের ছেলে এপারে চলে আসছিল। তখন ট্যাক্সি এসে ছেলেটাকে চাপা দেয়। মাথাটা গুঁড়িয়ে গেছে।

একটা বীভৎস দৃশ্য। রাত্রে রক্তের রং কালো দেখা যায়। তা হলেও বোঝা যাচ্ছিল জায়গাটায় রক্তের একটা পুকুর হয়ে গেছে। হাফ-প্যাণ্ট পরা খালি গা ছেলেটার শালপাতার ঠোঙ্গাটা

দুরে পড়ে আছে। ছেলেটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

'কাদের বাড়ির?'

'দশ নম্বর বাড়ির।'

'উঁহু, তেরো নম্বর বাড়ির।'

'ধ্যেৎ মশাই—পিছনের গলিতে থাকে। পিছনে একটা বস্তী আছে, সেখানকার ছেলে।'

'ট্যাক্সিটা কোন্ দিক দিয়ে পালাল?'

'ওদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে—চাপা দিয়েই আলো নিবিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গেল।' দু-তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

'পাঞ্জাবী ড্রাইভার?'

'না বাঙ্গালী।'

'ধ্যেৎ মশাই হিন্দুস্থানী।'

'পাঞ্জাবী পাঞ্জাবী।'

'বাঙ্গালী—মাথায় পাগড়ী ছিল না।'

'আপনি কি দেখেছেন?'

'না, ওই তো কে বলছিল। খাবার দোকান থেকে ছেলেটার পিছনে পিছনে আসছিল।'

'কে,—কোথায় গেল লোকটা?'

'কে জানে মশাই—হয়তো ভয়ে কোথায় লুকিয়েছে এখন। আমি চোখে দেখেছি বললে কি আর রক্ষে আছে। পুলিশ এসে হাজার রকম প্রশ্ন করবে। সে এক ঝামেলা মশাই। রাত দুপুরে হয়তো থানায় যেতে হবে। তার চেয়ে বাবা—'

'তার চেয়ে চোখ-কান বুজে থাকা ভাল—দেখিনি দেখিনি, ব্যস্ ফুরিয়ে গেল।'

'যা বলেছেন—যে গেছে সে তো আর ফিরবে না। সুতরাং—'

'ওর নিয়তি ওকে টানছিল। রাত দুপুরে জিলিপি কিনতে এসেছিল। বুঝুন অদৃষ্টের খেলা।'

দেখতে দেখতে একটা লরী এসে গেল।

'এই লরী, রোখো, রোখো।'

'অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাক্সিডেন্ট। আদমী খতম হো গিয়া।'

দশ-বারো জন লরীর সামনে হাত উঁচিয়ে দাঁড়াল। লরী দাঁড়িয়ে পড়ল। তিন-চারজন ধরাধরি করে ছেলেটাকে লরীতে তুলে দিল।

'মেডিকেল কলেজ।'

'না—নীলরতন কাছে হবে।'

'উঁহু, এখান থেকে মাড়োয়ারী হাসপাতাল চার মিনিটের রাস্তা।'

লরী চলে গেল।

ভিড় ভেঙ্গে গেল।

আর তখন—তখন বোঝা গেল এই মৃত্যু কী ভয়ংকর—এই বিচ্ছেদ একটি হৃদয়কে কতখানি শূন্য, একটি জীবনকে কেমন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেল।

একটি ছোট ছেলের হাত ধরে মাঝারি বয়সের একটি স্ত্রীলোক চিৎকার করতে করতে ছুটে সেখানে চলে এল। তারপর রক্তের জায়গাটায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'মণ্টু নেই—আমার মণ্টুকে কে নিয়ে গেল গো—উ হু হু—আমি কেন মণ্টুকে দোকানে পাঠালাম —আমি কেন—' কপালে বুকে করাঘাত করছিল আর বিলাপ করছিল স্ত্রীলোকটি। ছোট ছেলেটা ক্যাল-ক্যাল করে রাস্তার মানুষগুলির মুখ দেখছিল।

কিন্তু মানুষ বড় একটা আর দাঁড়িয়ে নেই। এই গলিতে সেই গলিতে তারা ঢুকে পড়ছে, এই বারান্দায় সেই বারান্দায় উঠে যাচ্ছে।

আর তখন হেলতে দুলতে খৈনি টিপতে টিপতে বুটের খটখট আওয়াজ তুলে বিট পুলিশকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। পাহাড়ের মতো শরীর। যেন এই মাত্র এত বড় একটা দুর্ঘটনার সংবাদ তার কানে গেছে।

'শালা ঐ লাল বাড়িটার রোয়াকে বসে ঘুমোচ্ছিল। ওর নাকের সামনে দিয়ে তো ট্যাক্সিটা পালিয়ে গেল।' একজনকে বলতে শুনলাম।

খবরটা কাল যুগভেরীতে ছাপতে দেব।

কিন্তু ভাবনায় পড়লাম—ঠিক কোন জায়গা থেকে দুর্ঘটনার বিবরণটা আরম্ভ করে কোথায় এনে শেষ করব ?

এবং এ-ও আশঙ্কা করছিলাম, এই খবর পড়ে খগেনবাবু অলক-বাবুরা আবার আমায় চেপে ধরবেন।

'মশাই—এ তো রোজ ঘটছে। এটা আবার একটা নিউজ হল নাকি ?'

'এর মধ্যে রহস্য নেই রোমাঞ্চ নেই—কোন মেয়েমানুষ এই খবরের সঙ্গে জড়িয়ে নেই—এমন বাজে উট্‌কো সংবাদ কুড়িয়ে আনতে থাকলে আপনার চাকরির মেয়াদ আর বড় জোর এক হপ্তা।' টাকে হাত বুলোতে বুলোতে চীফ রিপোর্টার সিদ্ধেশ্বর আমায় প্রথম সাবধান করে দেবেন এবং পরে হেসে বলবেন : 'না, মশাই, এই ভাল। গোড়া থেকে বেশি দিতে যাবেন না। একটু একটু করে এমন ছুটোছাটা অ্যাক্‌সিডেন্ট দিয়ে চালিয়ে যান। চাকরি কনফার্মড হোক—এক আধটা ইনক্রিমেণ্ট হোক, তবে তো বড় খবর।'

॥ পনেরো ॥

আজ শুক্রবার। আমার ছুটি। খবরের কাগজের শনি রবিবার নেই, দোল দুর্গোৎসব নেই। রোজ কাগজ বের করা চাই।

তাই পালা করে কাগজের অফিসের কর্মচারীদের ছুটি দেওয়া হয়। মাসের ত্রিশ দিন তো আর মানুষ কাজ করতে পারে না। নিয়মও নেই। আইনমত সপ্তাহের একটা দিন প্রত্যেকের জন্য ছুটি মঞ্জুর করা আছে। কাজের সুবিধার জন্য কারোর সোমবার কারোর মঙ্গলবার কারোর বুধবার ছুটি ঠিক করা আছে। রণধীর বাবুর ঘরে রিপোর্টার সাব-এডিটারদের ছুটির চার্ট ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকে মনটা হাল্কা ঠেকছিল।

ছুটির দিন প্রত্যেক কর্মচারীর মনের অবস্থা তাই হয়।

আগের দিন বিকেলে মিঃ রায় কলকাতার বাইরে গেছেন। আজ সারাদিন তিনি আসবেন না। ফিরতে সেই সন্ধ্যা। কোথায় গেছেন বলে যাননি।

তিনি যখন কোথাও বেরোন আমি প্রশ্ন করি না। নিজে থেকে যেটুকু বলেন তাই শুনে সন্তুষ্ট থাকি। কেননা সেদিন রণধীরবাবুর মুখে শুনেছিলাম যুগভেরীর কাজে মিঃ রায়কে নানা জায়গায় যেতে হয়। মাঝে মাঝে তিনি মফঃস্বলে যান। মিঃ রায়ের জন্য যুগভেরীর সার্কুলেশন এত বেড়েছে। 'গুড অর্গানাইজার।' রণধীরবাবু বলছিলেন: 'খবরের কাগজ কি করে চালাতে হয় মিঃ রায় এত ভাল বোঝেন, বাংলাদেশে খুব কম লোকই আছে তাঁর মতন।'

রণধীরবাবুর কথা শোনার পর থেকে মিঃ রায়ের ঘন ঘন বাইরে যাওয়া বা কোন কোন রাত্রে তিনি যদি ঘরে না ফেরেন তা নিয়ে

আমি আর চিন্তা করতাম না। প্রথম প্রথম কেমন হেঁয়ালীর মতো ঠেকত মানুষটাকে। এখন আর সেরকম কিছু মনে হয় না।

আজ ছুটির দিন বলে মিঃ রায় আমার ওপর একটা কাজের ভার দিয়ে গেছেন। আমাকে ডিক্সন লেনে যেতে হবে। একটা মোড়ক পৌঁছে দিতে হবে। মোড়কটার মধ্যে কি আছে আমি জানি না। মোড়কের ওপর বাড়ির নম্বর ও যার কাছে এটা পৌঁছে দিতে হবে তার নাম লেখা রয়েছে। একটি মেয়ের নাম। মীরা।

মোড়কটা আমার হাতে তুলে দিয়ে মিঃ রায় কাল যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যান তখন আমি নামটা দেখে চমকে উঠেছিলাম বৈকি।

আমি এখানে আসার পর মিঃ রায়কে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে কয়েকবার ঐ নামটা উচ্চারণ করতে শুনেছি।

আজ সকালে মোড়কটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি আর বার বার ঐ নামটা মনে মনে উচ্চারণ করেছি। নামটার প্রতি আমার চিরকাল মোহ। মীরা।

মীরার সঙ্গে মিঃ রায়ের সম্পর্কটা কি এখন পর্যন্ত আমার জানা নেই। তা হলেও আজ সেই মীরার কাছে যাচ্ছি ভেবে আনন্দ হচ্ছিল, আবার আশংকাও হচ্ছিল।

রিপোর্টার খগেনের কথাগুলি ভুলিনি। কে জানে, যদি এই মীরা মিঃ রায়ের আত্মীয়া বা সুস্থ সম্পর্ক আছে এমন কোন স্ত্রীলোক না হয়। না হওয়াটাই অসম্ভব বলে আমি ধরে নিয়েছি। মিঃ রায় সম্পর্কে কোন রকম খারাপ ধারণা পোষণ করা আমার পক্ষে পাপ। অন্তত তাঁর সঙ্গে কদিন থেকে মানুষটার খারাপ কিছু আমার চোখে পড়েনি। তবু সময় সময় মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। যদি তাঁর জীবনের সব কিছু জানতাম। তাঁকে আর কদিন দেখছি কতটুকু জানছি। তাঁর অনেকটাই আমার অজানা থেকে গেল। এ কি কম দুঃখের কথা।

মোড়কটা রেখে দিয়ে ভাল করে দাড়ি কামালাম। জুতোটা পরিষ্কার করলাম। মিঃ রায়ের টাইমপীসে নটা বেজে গেছে।

আজ আমি একলা ঘরে বসে চা খেয়েছি।

সাকুরা রেস্টুরেন্টের বুড়োটা এসেছিল চা দিতে। মিঃ রায় ঘরে নেই জেনে তাঁর চা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

সেই বুড়োটা একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতরটা দেখছিল। মিঃ রায় ঘরে থাকলে অবশ্য বেচারা চোখ তুলতেই সাহস পায় না।

হঠাৎ কাপ থেকে মুখ তুলে দেখি বুড়ো আমার দিকে চেয়ে অল্প অল্প হাসছে।

'হাসছ কেন।' অল্প হেসে আমি প্রশ্ন করলাম।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, রাগ করবেন?'

'না, কেন রাগ করব। কি বলো?'

আবার একটু চুপ থেকে বুড়ো ঘরের ভিতরটা দেখল।

'বড়বাবু কি আপনার কেউ হন?'

আমি হাসলাম।

'না, আমি তাঁর আশ্রয়ে আছি। আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'তিনি আপনার আত্মীয় না!'

'না।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বুড়ো একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। হঠাৎ আমি বুড়োকে প্রশ্ন করলাম: 'মিঃ রায়কে তো তুমি রোজ চা দিতে আসছ। কতদিন তিনি এবাড়িতে আছেন?'

'তা বছর দুই হবে।'

'তুমি সাকুরায় ক বছর আছ?'

'অনেকদিন বাবু, দশ বছর হয়ে গেল।' একটু থেমে বুড়ো বলল, 'কিন্তু কি করব বাবু, চায়ের দোকানের চাকরির খাটুনি বেশি। এই তো দেখছেন বুড়ো হয়ে গেছি, সোজা হয়ে হাঁটতে পারি না।

চোখে ভাল দেখি না। কিন্তু আমার মনিব তো আর তেমন লোক নন। পয়সাটাই চেনেন। নিজেরটাই চেনেন। দশ বছরে দশটা টাকাও মাইনে বাড়ল না।'

'বলো কি?' বুড়োর জন্য খুব কষ্ট হল। 'তুমি অন্য দোকানে চলে যাচ্ছ না কেন।'

'বাবু, সব দোকানই সমান। বুড়ো মানুষকে কেউ নিতে চায় না। রেস্টুরেণ্টে ছেলে ছোকরার আদর—এখন তো কেবল মেয়েছেলে চায়ের দোকানে, খাবার দোকানে ঢোকান হচ্ছে। দিনকাল ঘুরে গেছে বুঝলেন না।'

চুপ করে রইলাম।

'না বলছিলাম, রায়বাবুর আত্মাটা বড় ভাল। তাঁর কাছে আপন পর কিছু নেই। লোকের দুঃখে মানুষটার মন গলে। আমি চোখ দেখলে বুঝি।'

'তা তো বটেই, আমি তার কেউ না। কিন্তু আমায় কত সুখে রেখেছেন ছাখো।'

বুড়ো মাথা নাড়ল।

'জানি, আমায় লোক চেনাতে হবে না বাবু। গত পূজোয় বড়বাবু আমায় একখানা ধুতি দিয়েছেন। বড়বাবুর আত্মার মতন আত্মা আমার তো চোখে পড়ে না। এই কলকাতা শহরে কত মানুষ দেখছি।'

'না, এখন মানুষ নিজের স্বার্থ টাই দেখে, পরের দিকে তাকাতে চায় না।' বললাম, 'বড়বাবুকে বলে কাগজের অফিসে ঢুকতে পার কিনা ছাখো।'

বুড়ো হাসল।

'বলেছিলাম। কিন্তু বড়বাবু বলেন কাগজের অফিসে বেয়ারার কাজ নিলে রাত জাগতে হয়। আর বললেন সেখানে খাটুনি বেশি। ওপর নীচ ওঠানামা করতে হয় বার বার।'

'তা বটে, তা সত্যি।'

তারাচাঁদের কথা মনে পড়ল। হাজারবার নীচে যাচ্ছে ওপরে উঠছে। মিনিটে মিনিটে বাবুদের চা সিগারেট পান্ বিড়ি বাদাম মুড়ি তেলেভাজা এটা-ওটা আনতে হচ্ছে।

'পুজোয় কাপড় দিয়েছেন। তা ছাড়া দু চার ছ আনা রোজই বড়বাবুর কাছে বখশীস পাই। সোনার মানুষ। ভগবান তাঁকে সুখে রাখবেন।'

বুড়ো চলে গেল। আমি মনে মনে বললাম, সুখে রাখাই তো উচিত। ভাল মানুষ সুখে থাকবে। কিন্তু এই সংসারে কি নিয়মটা ঠিক থাকছে?

॥ ষোলো ॥

বাথরুমে বসে অনেকটা সময় লাগিয়ে স্নান করলাম। আজ দিনটা ভারি সুন্দর। শরৎ কালের মতো রোদ উঠেছে। আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

স্নান সেরে মিঃ রায়ের মতো তার বড় ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালাম মুখে পাউডার ক্রিম মাখলাম।

কেন জানি আমার প্রসাধন করতে খুব ইচ্ছা করছিল। অথচ এদিকে আমার খুব একটা যে দৃষ্টি আছে তা না। মিঃ রায়ের জন্য নিজের পোষাক ও চেহারা সম্পর্কে আমাকে সচেতন হতে হয়েছে। আজ আর একটু ভাল করে সাজগোজ করছিলাম, আমাকে ডিক্সন লেনে এক মীরার কাছে যেতে হবে বলে। মিঃ রায়ের একটা জিনিস পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। মিঃ রায় এত পরিচ্ছন্ন মার্জিতরুচির মানুষ। আমি তাঁর হয়ে আর এক জায়গায় যাচ্ছি। আমাকে সেজেগুজে যেতে হবে বৈকি।

সুটকেশ থেকে ধোয়া ভাঁজ করা রুমাল খুলে পকেটে পুরলাম। হঠাৎ খেয়াল হল রুমালে একটু সেণ্ট ঢেলে নিলে হয় না?

পাউডার ক্রিম বা সেণ্ট আমার নেই।

মিঃ রায়েরটাই ব্যবহার করছি।

সেণ্টের শিশিটা তাঁর টেবিলের ওপর দেখলাম না। হঠাৎ খেয়াল হল তিনি কাল বেরোবার সময় রুমালে সেণ্ট ঢেলে শিশিটা যেন টেবিলের টানার ভিতর রেখে গেছেন।

আমি কখনো তাঁর টেবিলের টানা খুলে দেখিনি। দরকার হয়নি। আমার ধারণা ছিল টানায় চাবি দেওয়া থাকে। কিন্তু একটু টানতেই সেটা খুলে গেল। সেণ্ট-এর শিশিটা তুলতে

গিয়ে একটা বড় খাম চোখে পড়ল। খামটা সরিয়ে শিশিটা বার করতে হবে। ভেবেছিলাম এমনি একটা সাদা খাম। ওপরে কিছু লেখাটেখা ছিল না। কিন্তু সেটা তুলে ধরতেই, সম্ভবত মুখটা খোলা ছিল, ভিতর থেকে পোষ্টকার্ডের সাইজের কতগুলি ফটো ঝুর ঝুর করে নিচে ছড়িয়ে পড়ল।

আমার দু'চোখ স্থির হয়ে গেল।

প্রত্যেকটা ফটো হাতে নিয়ে দেখলাম। সবই মেয়ের ছবি। যেন একটা বিশেষ বয়সের—যেমন ধরা যেতে পারে কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বয়সের এতগুলি মেয়ের ফটো যোগাড় করা হয়েছে। প্রত্যেকটা কার্ডের পিছনে স্টুডিওর নাম লেখা রয়েছে। কলকাতা শহরে কত স্টুডিও আছে একবার চিন্তা করলাম। গুণে ফেললাম চল্লিশটা ফটো।

সবগুলি আবার খামে পুরে রাখলাম।

ঠিক বুঝতে পারলাম না এতসব মেয়ের ছবি এখানে কেন। মিঃ রায় কি এগুলো জোগাড় করেছেন ?

না কি যুগভেরী কাগজে মেয়ে নেওয়া হবে বলে কোনদিন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। দরখাস্তের সঙ্গে ফটো চেয়ে পাঠান হয়েছিল কি ?

রুমালে সেণ্ট ঢালা হল না।

টানাটা টেবিলের ভিতর ঠেলে দিলাম।

না, এটা নিয়ে আমি কখনই এত ভাবতাম না, যদি সেদিন হারানবাবু খগেনবাবু অলকবাবুরা মিঃ রায় সম্পর্কে এতসব কথা না বলতেন।

মেয়ে দেখলে তিনি পাগল হয়ে যান। রাস্তায় একটি মেয়ে যাচ্ছে দেখলে মিঃ রায় ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েন। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর এই রোগ হয়েছে। যুগভেরী কাগজে মেয়েদের চাকরী দিতে তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। সেদিনের

সেই মেয়েটির মুখ আমার মনে পড়ল। তারাচাঁদের সঙ্গে যে কথা বলে চলে গেল। এখানে এতগুলি ফটোর মধ্যে সেই মুখটা দেখলাম না যদিও।

আজও আবার আমাকে একটি মেয়ের কাছে পাঠাচ্ছেন একটা মোড়ক দিয়ে। ভিতরে কি আছে আমি জানি না। কিন্তু সেই মেয়ে, যার নাম মীরা, এতগুলি ফটোর মধ্যে আছে কিনা তাই বা কে জানে।

আর একাদন, মিঃ রায় যেদিন হাওড়া স্টেশনে কে আসবে বলে ছুটে গেলেন, একটি মেয়ে টেলিফোন করেছিল না?

সে ঐ মীরাই কিনা আমার জিজ্ঞেস করা হয়নি বা সেও নিজে থেকে নামটা বলে নি।

না কি অন্য কোন মেয়ে?

হাওড়া স্টেশনে যাকে তিনি রিসিভ করতে গিয়েছিলেন সে পুরুষ কি মেয়ে এখন আমার মনে কেমন খটকা লাগল। অবশ্য মিঃ রায় বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধু আসবে।

কিন্তু তা হলেও, এখানে এতগুলি মেয়ের ফটো, মিঃ রায়কে নিয়ে খগেনবাবু অলকবাবুদের এত সব আলোচনা, আর প্রায় প্রত্যেকদিন একবার দুবার করে একটি মেয়ের সঙ্গে টেলিফোনে (একটি মেয়ে কি একটির বেশি বোঝা যাচ্ছে না, কেননা প্রত্যেক-বারই তো আর তিনি নামটা উচ্চারণ করেন না) কথা বলা—সব একত্র করলে কী দাঁড়ায়!

মিঃ রায় সম্পর্কে আমার চিন্তাটা আবার কেমন গুলিয়ে উঠতে লাগল।

মীরা নাম লেখা মোড়কটা হাতে নিলাম তারপর দরজায় তালা দিয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলাম। ডিক্সন লেন কোথায় আমি ইতিমধ্যে জেনে গেছি।

বাস ধরবার আগে আমি হোটেল ডি ল্যুক্স-এর দিকে হাঁটতে

লাগলাম।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সেখানে যাবে, মিঃ রায় কাল আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর কথাটা মনে আছে।

তাঁর কথার অবাধ্য হওয়া আমি এখনই কল্পনা করতে পারছিনা।

কিন্তু তবু হোটেলে ঢুকে খাবার টেবিলে বসে আমি ঠিক করতে পারছিলাম না মাছ খাব কি শুধু নিরামিষ খেয়ে বেরিয়ে আসব। কেননা চল্লিশটা মেয়ের ফটো আমার মাথায় ঘুরছিল।

ছোট বাড়ি। দেওয়ালের গায়ে মাধবীলতা ঝুলছে। দুপুর-বেলা। রাস্তাটা নির্জন। একটু সময় দাঁড়িয়ে বাড়ির চেহারাটা দেখলাম। মোড়কের ওপর বাড়ির যে নম্বর দেওয়া আছে তার সঙ্গে বাড়ির নম্বর মিলে গেছে।

কিন্তু তবু যেন সাহস হচ্ছিল না কড়া ধরে নাড়তে। ভিতর থেকে সদর বন্ধ।

কড়া না নাড়লে কেউ সাড়া দেবে না, কেউ বেরিয়ে আসবে না বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। আর সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিলাম, এই মেয়েটি কি সব চেয়ে দেখতে সুন্দর। তাঁর .টেবিলের টানার ভিতর যত-গুলি মেয়ের মুখ আছে একটি মুখও অসুন্দর না। সবাই সুন্দরী।

কিন্তু তা হলেও মিঃ রায় যত্ন করে একটা জিনিস পাঠাচ্ছেন এর কাছে। হয়তো উপহার টুপহার কিছু। যেন তখন হঠাৎ আমার ভীষণ ইচ্ছা করছিল মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ভিতরে কা আছে দেখতে। যেন একবার উপহারের জিনিসটা দেখতে পেলে মীরার মুখখানাও আমার দেখা হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়। যেন মিঃ রায়কেও সেই সঙ্গে আমি জানব, তাঁর মনের চেহারাটা দেখব।

নির্লজ্জের মতো একটা বাড়ির বন্ধ সদরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এসব ভাবছিলাম।

অবশ্য পরে এর জন্য আমার অনুতাপ হয়েছিল।

কেননা এত সহজে মানুষকে বোঝা যায় না চেনা যায় না। আমিও সেদিন মিঃ রায়কে চিনতে পারিনি, মীরাকে বুঝিনি।

আস্তে কড়া ধরে নাড়তে ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

আমি প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম দোর খুলে কোনো রূপসী তন্বী আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। না দাঁড়ালেও দরজার ফাঁকে একটি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ ভেসে উঠতে দেখা যাবে।

কিন্তু তা দেখা গেল না।

একটি ছেলে বেরিয়ে এল। ফর্সা টুকটুকে রঙ। পরণে হাফ্‌প্যান্ট।

'আপনি কাকে চাইছেন ?'

ছোট ছেলে। ন দশ বছর বয়স।

'আমি মিঃ রায়ের কাছ থেকে এসেছি', হেসে বললাম, 'তুমি বাড়িতে যেয়ে বলো।'

'ও, আচ্ছা' হেসে লাফাতে লাফাতে ছেলেটি ভিতরে চলে গেল। দুমিনিট পরে আবার সে বেরিয়ে এল।

'ভিতরে আসুন।'

আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

বাড়ির বাইরের চেহারাটা মলিন নিষ্প্রভ কিন্তু ভিতরটা উজ্জ্বল ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন।

একটি ছোট ঘরে আমাকে বসতে দিয়ে ছেলেটি লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। সিঁড়িটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। দুপাশে বাহারী পাতার টব। যেন একটা সবুজ বনের ভিতর দিয়ে ছেলেটি ওপরে উঠে গেল।

একটু পরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটি নিচে নেমে এল।

প্রশ্ন করতে যা উত্তর দিল শুনে আমি ও প্রতুল হতভম্ব হয়ে রইলাম।

তালতলায় তার বাসা। একটা বাড়ির একতলার একটা ঘর ভাড়া করে সে আছে। গলিটা নির্জন। কানা গলি বলে ওদিকে লোকজনের আনাগোনা একেবারে নেই। দুদিন ধরে কর্পোরেশনের গ্যাসের বাতিটাও জ্বলছে না। সুকুমারের ঘরের জানালা খুললে অন্ধকার ঘুটঘুটে গলিটা চোখে পড়ে। আজ তার বৌ ভূতের ভয় পেয়েছে। বাড়িওয়ালার ঝিকে পাঠিয়ে একটা রিক্সা ডাকিয়ে বৌ চলে এসেছিল সোজা যুগসন্ধি অফিসে।

তারপর? আমি প্রশ্ন করলাম, বৌকে রেখে এলে?

তার উত্তরে সুকুমার যা বলল তাও চমৎকার। ভজন সিং এসে জেনানার কথা বলতে সুকুমার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। দেখল অফিসের গেটে-এর কাছে রিক্সাটা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বৌ এভাবে চলে এসেছে কেন জানতে পেরে সে বৌকে খুব ধমক-টমক দিল। তারপর সেই রিক্সায় চেপে সে বৌকে রেখে আসতে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু বাড়ি ফিরে বৌ কাঁদাকাটা করতে লাগল। কিছুতেই একলা থাকতে পারবে না। ভূতের ভয়ে রাত্রে সে ঘুমোতে পারবে না। অথচ ওপরে বাড়িওলা রয়েছে। তাদের অনেক লোকজন।

তারপর? আমি প্রশ্ন করলাম, 'এখন বৌকে কোথায় রেখে এলে।' সুকুমার আঙুল দিয়ে যুগসন্ধি অফিসের জানালার বাইরেটা দেখিয়ে দিল। আমি ও প্রতুল উঁকি দিয়ে দেখলাম গেট-এর কাছে রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।' সিদ্ধেশ্বর এখানে থামলেন।

রণধীর হাসছিলেন।

'তার মানে বৌকে সঙ্গে করে সুকুমার অফিসে ফিরে এসেছিল?'

সিদ্ধেশ্বর ঘাড় নাড়লেন।

'সাড়ে তিন টাকা রিক্সা খরচ হল সেই রাত্রে।'

'তারপর ?' অলকবাবু প্রশ্ন করলেন। 'সুকুমারকে সেই রাত্রির মত ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন তো ?'

'হুঁ', সিদ্ধেশ্বর গম্ভীর গলায় উত্তর করলেন, 'আর তৎক্ষণাৎ আমি সাংবাদিকের ঘরে ভূত হেডিং দিয়ে একটা নিউজ তৈরী করে প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম। অবশ্য সুকুমারের নাম, যুগসন্ধি কাগজের সাব-এডিটার কিছু উল্লেখ করা হল না।'

'তারপর ?' খগেনবাবু সিগারেট না ধরিয়ে নস্যির টিপ নিয়ে নাক চোখ কুঁচকে সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকালেন : 'বৌ ভূতের ভয় পায় রাত্রে একলা থাকতে—যুগসন্ধির কর্তৃপক্ষ সেটা বিবেচনা করে সুকুমারকে কি নাইট-ডিউটি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।'

'তা দিয়েছিলেন বৈকি। না হলে তার বৌ বুদ্ধি করে সাড়ে তিনটাকা রিক্সার পিছনে খরচ করতে যাবে কেন।'

অলকবাবু এবার ঠোঁট টিপে হাসলেন।

'অর্থাৎ বৌয়ের বুদ্ধিতে সুকুমার রাত জেগে অফিস করার হাত থেকে রক্ষা পেল।'

সিদ্ধেশ্বর আর কিছু বললেন না।

'এটা যদি একটা ঘটনা হয় আর তা নিউজ করে কাগজে ছাপান হয় তো সাপে ব্যাং ধরেছেও একটা খবরের মতো খবর। ছোঃ।'

'কেন, এতে নারী আছে, রক্ত গরম হওয়া আছে। নতুন বিয়ে হয়েছে তাদের। চমৎকার ঘটনা।'

রসিক সিদ্ধেশ্বরের কথায় সকলে হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু হারাণবাবু নীরব থেকে গেলেন।

কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছিল সিদ্ধেশ্বরবাবু মাথা খাটিয়ে খবরটা তখনকার মতো তৈরী করেছিলেন। আমরা যারা ভয়ংকর সব ঘটনা চাঞ্চল্যকর সব সংবাদের জন্য ছটফট করছিলাম তাদের জব্দ করতে তিনি সাব-এডিটারের বৌয়ের ভূতের ভয় পাওয়া

গল্পটা পরিবেশন করলেন। কেননা পরক্ষণে তিনি তাঁর বক্তব্যের উপসংহার স্বরূপ মন্তব্য করেছিলেন : 'যাদের সূক্ষ্ম রসবোধ আছে তারা এই খবর পড়ে আনন্দ পাবে। মোটাবুদ্ধি মানুষের জন্য মোটা মোটা খবর।'

তারপর আর আড্ডা জমেনি। টেলিফোনে ডাকছে শুনে রণধীর তাঁর ঘরে চলে গেছেন। অলকবাবু এসেম্বলী করতে চলে গেছেন। খগেনবাবু খেলার মাঠের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছেন। এগজামিন হল থেকে মেয়ের বেরোবার সময় হয়েছে, তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে বলে সিদ্ধেশ্বরবাবু আসন ছেড়ে উঠলেন।

একটু পর 'আমি ঘুরে আসছি' বলে হারাণবাবুও উঠে বেরিয়ে গেলেন।

তখন আমি একলা। না আর একজন ছিল। আমার সমবয়সী, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তারাচাঁদ। খুট খুট করে বাদাম ভেঙ্গে মুখে পুরছিল। একটা পাখা বন্ধ করে দিয়েছে সে। আমার মাথার ওপর একটা পাখা ঘুরছিল। খুব একটা দরকার না হলে আমি তার সঙ্গে কথা বলি না। সেও বলে না।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তার সঙ্গে কথা বলবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল আমার।

এমনি। হয়তো কিছু দরকার ছিল না।

'এখানে কি বাদাম পাওয়া যায়।' সরাসরি তাঁরাচাঁদকে প্রশ্ন না করে অনেকটা যেন নিজের মনে কথাটা বললাম।

তারাচাঁদ তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চোখ ফেরাল।

'গেট-এর কাছে বাদাম বিক্রী হচ্ছে।'

আমি খুশি হলাম।

পকেট থেকে একটা দশ নয়া বের করলাম।

'এক ছটাক বাদাম আনা যাক—বসে বসে খাওয়া যাক।'

'দিন আমি এনে দিচ্ছি।' কোল থেকে বাদামের খোসাগুলি

ঝেড়ে ফেলে সে উঠে দাঁড়াল।

যেন তারাচাঁদেরও খুব ইচ্ছা হচ্ছিল সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলে। পয়সা নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ বাদাম আনতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

টেলিফোনে কথা সেরে রণধীর আবার আমাদের ঘরে ঢুকলেন। চেয়ারগুলির দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'সব ফাঁকা?'

মাঝে মাঝে তিনি কথাটা বলেন। আমি চুপ করে রইলাম। নিউজ এডিটার হিসাবে এরকম একটা মন্তব্য করার অধিকার তাঁর আছে জেনে আমি চুপ করে রইলাম। আর এটাও সত্য, সবাই সবসময় অফিসের কাজে যে বেরিয়ে যায় এমন না, অনেকসময় নিজেদের কাজে বা এমনি রিপোর্টারদের মধ্যে কেউ কেউ বাইরে চলে যায়। হয়তো আড্ডা দিতে হয়তো সিনেমা দেখতে। যেমন সেদিন সিদ্ধেশ্বরবাবু বেরিয়ে গেলেন, হারাণবাবু বেরিয়ে গেলেন।

অবশ্য সেজন্য রণধীর খুব একটা কিছু মনে করেন না।

এখানে এসে আমি লক্ষ্য করেছিলাম কাগজের অফিসের হাওয়াটা অন্যরকম। গ্যাঞ্জেস হোসিয়ারী মিলের মতন না।

অফিসে হাজিরা দেওয়া কি বাইরে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা এখানে অনেক বেশি।

আমরা কাগজের অফিসের কর্মচারীরা সেই স্বাধীনতার সুযোগটা মাঝে মাঝে একটু বেশি ব্যবহার করতাম সন্দেহ ছিল কি?

তা হলেও রণধীর হাসছিলেন।

'হারাণবাবু বেশ জব্দ হয়েছেন।'

আমি শুধু হাসলাম।

'তাই মন খারাপ করে বাইরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।'

রণধীর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তবে আমার মনে হয় সিদ্ধেশ্বর

বাবু আজ একটু বেশি বলে ফেলেছেন।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।' এবার আমি একটু উৎসাহবোধ করলাম। 'কিন্তু আমি বলছি, সংসারে আশ্চর্য ঘটনা অপ্রত্যাশিত ঘটনাও তো কত ঘটছে।'

'তাই।' রণধীর ঘাড় কাত করলেন। 'হয়তো এমন কিছু ঘটল যা আমাদের চিন্তার বাইরে, অনেক সময় বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না কেন এমন ঘটল, কেন অন্যরকম কিছু হল না।' একটু চুপ থেকে রণধীর আবার বললেন, 'কিন্তু হারাণবাবু বলতে চাইছেন সংসারের অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য ঘটনাগুলোর সাড়ে বারো আনা মেয়েমানুষের জন্য ঘটছে।'

আমি আবার চুপ করে রইলাম।

টেলিফোন গর্জন করে উঠতে রণধীর আবার তাঁর ঘরে ছুটে গেলেন। তারাচাঁদ বাদাম নিয়ে ফিরে এল।

ঠোঙা থেকে এতটা বাদাম তুলে আমি তারাচাঁদের হাতে দিলাম।

'না না আমাকে কেন, আমি তো খাচ্ছিলাম।'

'আহা, সব আমি একলা খাব কেন।'

অর্থাৎ সামান্য কটা চিনাবাদামের ভিতর দিয়ে তুজনের মধ্যে একটা আপোষ রফা হয়ে গেল। তারাচাঁদের মনের ভার কাটল। আমার মনও হাল্কা হল।

বেঞ্চিটা টেনে এনে তারাচাঁদ আমার সামনে বসল।

মুখোমুখি হয়ে বসে তুজন বাদাম খেতে লাগলাম। একটু সময় পার করে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

'তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'বলুন।' বাদাম চিবানো বন্ধ করে তারাচাঁদ আমার চোখ দেখতে লাগল।

'তুই তো আমার চেয়ে বেশি সময় অফিসে থাকিস, তাই না?'

তারাচাঁদ ঘাড় নাড়ল।

'তা ছাড়া শুক্রবার আমি আসিনি। আমার ছুটি ছিল।' আস্তে বললাম।

'হুঁ, আমার সোমবার সোমবার ছুটি থাকে।'

'যাক গে।' এদিক ওদিক তাকিয়ে তেমনি নিচু গলায় প্রশ্ন করলাম। 'আচ্ছা, এর মধ্যে ঐ মেয়েটি আর এসেছিল ?'

তারাচাঁদ ফিক করে হাসল।

'সেই যে লাল শাড়ী ?'

'হুঁ, আমি প্রথম দিন এ-ঘরে বসতে না বসতে যে এসে দাঁড়িয়েছিল ?'

'বুঝেছি। তারাচাঁদ লম্বা করে ঘাড় বেঁকাল। 'আপনি বলতে আমি ধরে ফেলেছি।'

চুপ করে রইলাম।

পর পর চার পাঁচটা বাদাম ভেঙ্গে তারাচাঁদ মুখে পুরল তার মুখে কথা নেই। অথচ মিটমিট করে হাসছে।

তার হাসিটা আমার ভাল লাগল না।

যেন সে সেদিনের কথা ভাবছে। আমার সঙ্গে একটাও কথা বলল না আর তার সঙ্গে এত কথা বলে গেল মেয়েটা।

'চুপ করে আছিস কেন ?'

তারাচাঁদ আমার দিকে চোখ তুলল। বাদামের খোসাগুলি কোল থেকে ঝেড়ে ফেলল। এদিক ওদিক তাকাল। তারপর আমার মতো গলার স্বরটা নিচু করে ফেলল।

'ও কোথায় থাকে আমি জানি।'

আমার চোখ দুটো বড় হয়ে গেল।

'কি করে জানলি তুই ?'

'আমি দেখেছি।'

'কোথায় দেখলি ?'

'আমি দর্জিপাড়ায় থাকি।'

'তুই কি রোজ দর্জিপাড়া থেকে আসিস ?'

তারাচাঁদ মাথা নাড়ল।

'বীডন ইস্ট্রীট মানিকতলার ভেতর দিয়ে সোজা আমহার্স্ট ইস্ট্রীটে চলে আসি, তারপর হাঁটতে হাঁটতে কলেজ ইস্ট্রীট—'

'বুঝলাম বুঝলাম, হেঁটে তুই রোজ অফিস করিস, এই তো বলতে চাস ?'

'যুগভেরী আর ক'টাকা মাইনে দেয় তাও তো আবার বেয়ারার চাকরি। ট্রাম বাসে যদি সব খরচ করি তো খাব কি ?'

তারাচাঁদের চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠল।

'তা তো বটেই—তা আমি খুব বুঝতে পারি। ঠোঁটের কোণায় বাদামের একটা পাতলা খোসা লেগে ছিল যেন। আঙুল দিয়ে সেটা সরিয়ে ফেললাম। 'হুঁ, কিন্তু তুই কোথায় দেখলি ওকে ?'

'মসজিদ বাড়ি ইস্ট্রীটে।'

'ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল বুঝি ?'

'না।'

'তবে ?'

'একটা বাড়িতে।'

'তুই কি সে-বাড়িতে ঢুকেছিলি নাকি ?'

তারাচাঁদ চাপা গলায় হাসল। এদিক ওদিক তাকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'বাড়িতে ঢুকব কেন, ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।'

'ঠিক চিনতে পেরেছিলি ওই মেয়েটি ?'

'এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি—'

একটু সময় চুপ থেকে পরে বললাম, 'তা সেদিন তো এখানে পাঁচ সাত মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল—তুই আবার নিচে গেলি সঙ্গে সঙ্গে। কেমন না ?'

তারাচাঁদ মাথা নাড়ল।

'আমি কি জানতাম যে মেয়েছেলেটা মসজিদবাড়ি ইস্ট্রীটের ওই রাড়িটায় থাকে, তবে কি আর সেদিন পিছু পিছু যেতাম, আমি কথাই বলতাম না ওর সঙ্গে।'

'কেন!' তারাচাঁদের চোখের ভিতর তাকাই। 'ওকথা বলছিস কেন? মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটের সেই বাড়িটা কাদের?'

তারাচাঁদ আমার প্রশ্ন শুনে কেমন করে জানি হাসল। মাথা গুঁজে পা দিয়ে বাদামের খোসাগুলি মেঝেয় ছড়াতে লাগল।

'হঠাৎ আবার চুপ করে গেলি কেন?'

তারাচাঁদ চোখ তুলল।

'বাড়িটা বাজে।'

'বাজে মানে।'

'খারাপ মেয়েমানুষ থাকে।'

হঠাৎ আমিও চুপ করে গেলাম।

হারাণবাবু ঢুকলেন।

আলোচনাটা সেখানে থেমে রইল।

॥ আঠারো ॥

মিঃ রায় পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোলেন। আমি ডাকিনি। কেননা অনেক রাত করে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। সকালে উঠে আমি বাথরুমের কাজ সেরে ফেলেছি। চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। সাকুরার বুড়ো আমার চা দিয়ে গেছে। বড়বাবু ঘুমোচ্ছেন দেখে তাঁর চা নিয়ে ফিরে গেছে। কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেছে। আমি খেলার খবর পড়ছিলাম। মিঃ রায়ের ঘুম ভাঙ্গল। বিছানায় উঠে বসে হাই তুলতে তুলতে তিনি দুবার আমার দিকে তাকালেন।

আমি কাগজ থেকে চোখ তুলতে তিনি মৃদু হাসলেন।

'চা খেয়েছো?'

'হুঁ।'

'আমায় ডাকলে না কেন?'

লজ্জা পেলাম।

'তা ভালই করেছ—ঘুমোতে ঘুমোতে রাত দুটো বেজে গেল।' মিঃ রায় আর একটা হাই তুললেন। হঠাৎ তারাচাঁদের কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট কোথায় জানি না। তা হলেও মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের একটা দোতলা বাড়ির ছবি আমার সামনে ভেসে উঠল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন চুল আঁচড়াচ্ছে এমন ছবিও চোখের সামনে ভাসছিল। খাট থেকে নেমে মিঃ রায় চটি পরছেন। এখন তিনি বাথরুমে যাবেন। তিনি ঘুরে দাঁড়াতে আমি ভাল করে মানুষটার পিঠ ঘাড় কাঁধ মাথার পিছনটা দেখলাম। অথচ তিনি যখন খাটের ওপর বসে ছিলেন তাঁর মুখের দিকে এমন ভাল করে তাকাতে পারিনি। সাহস পাইনি।

এখন তাঁকে চুরি করে দেখছি বলে অনুতাপ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও না দেখে পারলাম না।

মিঃ রায় যখন বাথরুমে চলে গেলেন তখন যুগভেরীর দুষ্ট বেয়ারা তারাচাঁদের ওপর আমার রাগ হল। কিন্তু তারপর চিন্তা করলাম তারাচাঁদের ওপর আমি খামকা রাগ করছি। চাকরি পাবার আশায় মিঃ রায়ের কাছে তো কত মেয়েছেলে আসে। হয়তো ওই খারাপ মেয়েটা মিঃ রায়কে সেজন্য খুঁজেছিল। খুঁজেছিল, কিন্তু দেখা পেয়েছিল কি? মিঃ রায় তাকে চেনেনও না। মিঃ রায়ের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় আছে তারাচাঁদ বলেছিল কি? বলেনি। তারাচাঁদের ওপর রাগ করার জন্য আমার কষ্ট হল। গরীব বেচারা। যুগভেরী আর ক পয়সা মাইনে দেয়। রোজ রৌদ্রে পুড়ে জলে ভিজে কতটা পথ হেঁটে তারাচাঁদকে অফিস করতে হয়। বরং আমার নিজের ওপর রাগ হল। ওই খারাপ মেয়েটার সঙ্গে মিঃ রায়কে আমিই যোগ করতে গিয়েছিলাম। আর তা করতে গিয়ে মানুষটার পিঠ ঘাড় মাথার পিছনটা পরীক্ষা করছিলাম। যেন পিঠ কাঁধ মাথা দেখে আমি তাঁর ভিতরটা দেখতে চেয়েছিলাম, তাঁর মন, তাঁর স্বভাব।

অথচ আজও আমি যুগভেরীর টাকা পাইনি। আমি এই মানুষটার খাচ্ছি, তাঁর ঘরে থাকছি, তাঁর টাকায় জামা জুতো কিনে পরছি।

বাথরুমে জল পড়ার ছড়ছড় শব্দ হচ্ছিল।

আর নিজের পাপ চিন্তার জন্য দুঃখে রাগে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল।

মিঃ রায় ফিরে এলেন। সাহস করে তাঁর মুখের দিকে এবার তাকাতে পারলাম। দেবতার মতন রূপ। চরিত্রও দেবতার মতন। সাকুরার বুড়োর কথা মনে পড়ল। 'রায়বাবুর আত্মার মতন আত্মা আমার চোখে পড়ে না।'

বুড়োর কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ো চা নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল।

মিঃ রায়ের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তুমি আরো অনেকদিন বাঁচবে বুড়ো—এখুনি তোমার কথা ভাবছিলাম। একবার এসে ফিরে গেছে—আবার চা নিয়ে আসতে কত দেরি হবে কে জানে।' হা—হা, দরাজ গলায় মিঃ রায় হাসলেন।

সেই হাসি দেখে আমার মুখেও হাসি ফুটল। বুড়োও হাসল।

'আমি কি জানি না। বেলা করে বড়বাবুর ঘুম ভাঙ্গলে আবার ঠিক কোন্ টাইমে চা এনে দিতে হবে আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে।' বুড়ো মিঃ রায়ের হাতে চা তুলে দিল।

'দাঁড়াও।' মিঃ রায় ডাকলেন।

শূন্য কেটলি হাতে বুড়ো দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। বালিশের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে মনিব্যাগ টেনে বার করলেন মিঃ রায়।

'এই নাও, কাল তো ঘরে ছিলাম না—কালও কিছু দেওয়া হয়নি।'

বুড়ো হাত বাড়িয়ে আধুলিটা নিল। এক হাতে আধুলি আর এক হাতে কেটলি। এই অবস্থায় তুটো হাত একত্র করে কপালে ঠেকাল।

বুড়ো বেরিয়ে যেতে মিঃ রায় চায়ে চুমুক দিলেন।

'তারপর বিনু, খেলার খবর কি!'

'এরিয়ান্সের আর একটা পয়েণ্ট নষ্ট হল।'

'তুমি কি খেলার মাঠে যাচ্ছ।'

'না, খগেনবাবু খেলার রিপোর্ট করছেন।'

'তুমিও একদিন যাবে, এখন স্ট্রে নিউজ করে হাত পাকাও।'

'ভাল খবর জোগাড় করতে পারছি না।'

'আস্তে আস্তে পারবে। সব খবরই খবর। ছোট-খাটো ঘটনা নিয়ে ইণ্টারেস্টিং নিউজ তৈরী করায় কৃতিত্ব বেশি।

হাত থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'আমাদের পাড়ায় সেদিন ট্যাক্সি চাপা পড়ে ছেলেটা মারা গেল খবরটা আমি করেছিলাম।'

'আমি জানি।' মিঃ রায় পোষাক পরতে আরম্ভ করলেন আজ আবার এত সকালে তিনি বেরিয়ে যাবেন ভাবিনি। কি বললাম না। চোখ নামিয়ে যুগভেরী দেখছিলাম।

'রণধীর মোহিনীকে বলেছে। মোহিনী তোমার নিউজ দেখে খুশি হয়েছে। আমায় কাল ফোন করেছিল।' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ রায় টাই বাঁধছিলেন। তাঁর কথা শুনে আমি খুশি হলাম।

'ভাল কথা।' হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। 'কাল প্যাকেটটা পৌঁছে দিয়েছিলে? ঠিকানা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি?'

'না না, হোটেল থেকে বেরিয়েই তিন নম্বর বাস ধরলাম, কিছু অসুবিধা হয়নি যেতে। সার্কুলার রোড থেকে বেরিয়েছে ডিক্সন লেন। উলের প্যাকেটটা ওর হাতে দিয়ে দিয়েছি।'

নিশ্চিন্ত হয়ে আয়নার দিকে তিনি ঘুরে দাঁড়ান। হাসেন।

'আমার জন্য একটা মাফলার বুনবে। কদিন ধরে উল উল করছিল। একটু বড় হয়েছে। এটা ওটা সেলাই একটু আধটু উলের কাজের সখ এই বয়স থেকে মেয়েদের আরম্ভ হয়।' কথা-গুলি তিনি এখন নিজের মনে বলছিলেন। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে বলছিলেন। 'কে জানে উলটা ওর পছন্দ হবে কিনা। আমার জন্য মাফলার। কিন্তু পছন্দটা ওর। এই রঙের উল না, সেই রঙের চাই।'

শীর্ণ পাণ্ডুর একটি মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। টাই বাঁধা শেষ হতে মিঃ রায় আর একবার মাথায় চিরুনি বুলিয়ে

নেন। একটু পাউডার স্নো মাখলেন। তারপর টেবিলের টানা থেকে এসেন্সের শিশি বার করে ভাঁজ করা রুমালে কয়েক ফোঁটা ঢেলে নেন। ডিক্সন লেনের নীরক্ত ক্যাকাসে মুখটা আমার চোখের সামনে থেকে হঠাৎ মিলিয়ে গিয়ে সেখানে এতগুলি রূপবতী স্বাস্থ্যবতী যুবতীর মুখ জ্বলজ্বল করছিল।

'আমি চলি, বিনু।'

উঠে দাঁড়ালাম। সিঁড়ি পর্যন্ত তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি নিচে নেমে গেলেন। ঘরে ফিরে এলাম। টেবিলের সেই টানার দিকে আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

যেন আবার আমার সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল।

তৎক্ষণাৎ তারাচাঁদের কাছে ছুটে গিয়ে আবার সেই মেয়েটার কথা জানতে ইচ্ছা করছিল।

যেন দুজনে মিলে আবার কিছুক্ষণ মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের সেই বাড়িটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে একটা রন্ধ্র সৃষ্টি করা যাবে। তখন সেই রন্ধ্র দিয়ে আলো দেখা যাবে। আর কিছু অন্ধকার ঠেকবে না। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

॥ উনিশ ॥

সারাদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

বিকেলের দিকে আকাশটা এমন একটা চেহারা করে রইল দেখে গা ঘিন ঘিন করতে লাগল।

একটা ঝড়-ঝাপ্‌টা হয়ে যাক নয়তো এমন জল হোক যেন কেবল ঠনঠনে কলুটোলা বীডন স্ট্রীট মানিকতলা তালতলা না, গোটা কলকাতা শহরটা তলিয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃষ্টি হোক।

মনে মনে তাই চাইছিলাম। একটা কিছু হোক আকাশের গুমগুমে বিশ্রী চেহারাটার জন্য আমার মাথা ধরেছিল। গা বমি ভাব করছিল।

'চললেন ?'

'হুঁ।' সিদ্ধেশ্বরবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। 'নিউজ এডিটার বেরিয়ে গেছেন। তাই আপনাকে বলে যাচ্ছি—ভীষণ মাথা ধরেছে।'

'তা বলতে হবে না, শরীর খারাপ লাগছে যখন—' হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরবাবুর কি মনে পড়ল। 'শুনুন।'

'বলুন।'

'গা ম্যাজম্যাজ করছে ?'

'একটু একটু।'

'ঐ যা ভেবেছি—টিপ টিপ বৃষ্টিটা মাথার ওপর দিয়ে গেছে তখন, কেমন না ?'

আমি ঘাড় কাত করলাম।

'তা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজলেন, বারান্দার ছাদটাদ ধারে কাছে ছিল না বুঝি।'

'না।'

'এক কাজ করুন, একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা টেবলেট খেয়ে নিন। ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে চারদিকে।'

'তা দেখি।' কেননা আমি একটুও ভিজিনি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে এমন কোন লক্ষণ শরীরে ছিল না। কেবল সকাল সকাল বেরোবার জন্য এত কথা।

দুপুরের দিকে মৌলালীর মোড়ে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। সাধারণ ঘটনা। একটা লরী রাস্তা ছেড়ে পেভমেণ্টের ওপর উঠে গিয়েছিল। কলা বিক্রী করছিল একটা হিন্দুস্থানী মেয়েছেলে। লরীটা ওর গা ঘেঁসে গেছে। মরেনি। ছিটকে পড়েছিল দূরে। মাথায় চোট লেগেছে। একটা হাঁটু বুঝি মচকে গেছে। হাসপাতালে নিয়ে গেছে তখুনি। আ লরীর ধাক্কায় একটা মিষ্টির দোকানের শো-কেসের কাচ চুরমার হয়ে গেছে। এই পর্যন্ত। ড্রাইভারটার কিছুই হয়নি। এ-ধরনের খবরের প্রতি আমার আর লোভ নেই, বৃষ্টিতে ভিজে রি[illegible] তৈর করব না ছাই—তখনি একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়েছিলাম। সেখানে চার পাঁচজন বসে ঐ অ্যাকসিডেন্টের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। শুনে শুনে আমিও যুগভেরীর জন্য চমৎকার একটা রিপোর্ট তৈরী করে ফেললাম। তাই সিদ্ধেশ্বরবাবু জলে ভেজার কথা বলছিলেন। এই খবরের জন্য জলে ভিজব না আরো কিছু। আমি অন্য খবর খুঁজছিলাম—খবরের আশায় আর এক জায়গায় যেতে কখন থেকে ছটফট করছিলাম। তাই শরীর খারাপ লাগছে ছুতো করে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেড়িয়ে পরলাম।

আজ তারাচাঁদের ডিউটি দশটা পাঁচটা ছিল। তাতেই আমার সুবিধা হল।

'আয়, আগে একটু চা খাওয়া যাক।'

তারাচাঁদ আপত্তি করল না।

একটা ছোট দোকানে ঢুকলাম দুজন।

লোকজন নেই। ভিতরটা একেবারে ফাঁকা।

এমন একটা জায়গা আমি খুঁজছিলাম।

'কি খাবি ?'

'ঐ এক কাপ চা।' সঙ্কোচ কাটছিল না তারাচাঁদের। আমি একজন সাব-এডিটার। সে বেয়ারা। অথচ আমার পাশে চেয়ারে বসিয়ে তাকে চা খাওয়াচ্ছি।

'শুধু চা খায় না। এই বয়।' বয় কাছে আসতে আমি চিংড়ি কাটলেট বলে দিলাম।

তারাচাঁদ চুপ করে রইল।

'তুই সিগারেট খাস ?'

চোখ তুলে তারাচাঁদ মিটমিট হাসতে লাগল।

'আহা লজ্জার কি আছে। এটা অফিস না। সেখানে না হয় আমি বাবু, তুই বেয়ারা। এখানে আমরা দুজন সমান।' বাক্স থেকে একটা সিগারেট তুলে তার হাতে গুঁজে দিলাম।

'আগে খেয়ে নি, পরে খাব।' সিগারেটটা বাঁ হাতের মুঠোয় রাখল সে।

'শোন্—একদিনই বারান্দায় দেখেছিলি, না আরো দু-একদিন দেখা গেছে ?'

'একদিন—চুল আঁচড়াচ্ছিল।'

'বেশ লম্বা চুল, মিশমিশে কালো কেমন না ?'

'ওর সবই সুন্দর, চুল, গায়ের রং, নাক, শরীর।' তারাচাঁদ একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। আমি চুপ করে রইলাম। কাটলেট এসে গেল।

'খা।'

'কাঁটা চামচ দিয়ে সুবিধা করতে পারব না।'

'এমনি খা হাত লাগিয়ে খা।'

আমার কথামতন তারাচাঁদ হাত দিয়ে কাটলেট ছিঁড়ে মুখে

পুরতে লাগল। আমারও ইচ্ছা করছিল হাত দিয়ে খাই। কাঁটা চামচের অভ্যাস তেমন আর ছিল কোথায়? কিন্তু কাঁটা চামচ দিয়েই খেতে লাগলাম। অন্তত একটা জায়গায় তারাচাঁদের সঙ্গে ব্যবধান রক্ষা করতে পারছি জেনে ভিতরে ভিতরে খুশি হলাম।

'তোর ইচ্ছা করে না ওই মেয়েছেলেটার কাছে যেতে?'

'ধ্যেৎ!' তারাচাঁদ এমন চেহারা করে আমার দিকে তাকাল যেন একটা খুব খারাপ কথা বলে ফেলেছি।

'কেন, তুই তো ব্যাটাছেলে—না কি মেয়েমানুষ?' কনুই দিয়ে তার পাঁজরে ছোট একটা গুঁতো দিলাম।

একটু হাসল সে। তারপর ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল।

'কি হল চুপ করে গেলি কেন?

'না, বাবু আমার বৌ আছে একটা বাচ্চা আছে।' ঘাড় গুঁজে মিনমিনে গলায় বলল সে।

উৎসাহটা কেমন যেন জল হয়ে গেল। তারাচাঁদ বিয়ে করেছে আমি জানতাম না।

চা এসে গেল।

'শোন তা হলে।'

তারাচাঁদ চোখ তুলল।

'তোর বৌ আছে যখন দরকার নেই, আমি যাব—আমি তো আর বিয়ে করিনি—আমায় নিয়ে চল্।'

'আমি আর নিয়ে যাব কেমন করে—যদি বলেন তো বাড়িটা দেখিয়ে দেব আপনাকে।'

খুশি হলাম। তাই চাইছিলাম আমি।

'কবে যাবি, আজ? এখন?'

'এখন তো আমি বাজার করব। বাজার নিয়ে বাড়ি গেলে তবে বৌ রান্না করবে।' এতক্ষণ পরে তারাচাঁদ একটু স্বাভাবিক হল। হাসল।

'বেশ, তা হলে সোমবার? সোমবার তোর ছুটি না?'

তারাচাঁদ খুশি হয়ে ঘাড় নাড়ল।

'সেই ভাল, সোমবার। ছুটির দিন আপনাকে নিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না।'

'তোকে কোথায় পাব?

'আমি বেড়াতে বেড়াতে সেদিন বিকেলের দিকে অফিসে চলে আসব। আপনি আজকের মতন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যখন তখন বেরোতে পারি—আমরা রিপোর্টার বাইরে তো আমাদের কাজ থাকে—সোমবার মনে রাখিস।'

'আমার মনে থাকবে।' লম্বা চুমুক দিয়ে তারাচাঁদ বাকি চা-টা শেষ করল। কি একটু ভাবল। পরে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আপনি বলছেন, ওসব জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে কি না। যেতে কি আর ইচ্ছে করে না—থাকলই বা বৌ ঘরে—কিন্তু পয়সা পাব কোথায়? ওসব জায়গায় যেতে, আর মাগীটা যখন দেখতে ভাল, অনেক টাকা লাগবে।'

একটু চিন্তিত হলাম।

'কত টাকা লাগবে শুনি?'

'তা বলব কেমন করে।' এদিক ওদিক তাকিয়ে তারাচাঁদ প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের পাড়ার নিতাই একদিন হাড়কাটায় একটা মাগীর কাছে গিয়েছিল। গুনে গুনে পাঁচটা টাকা নিয়েছে। তাও তো শুনছি মেয়েটা কালোমতন ছিল দেখতে। আর, আপনি যেখানে যাবেন, আগুনের মতন গায়ের রং, এই চুল—হুঁ, দশ টাকা লেগে যাবে।'

'তা জোগাড় করা যাবে—আমার কাছে আছে, সোমবার, ভুলিস না কিন্তু।'

'আমার মনে থাকবে।'

'আচ্ছা শোন্—' ভুরু কুঁচকে কথাটা একটু চিন্তা করলাম, তারপর

তারাচাঁদের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'আমাদের অফিসে মিঃ রায়ের খোঁজে ও গিয়েছিল কেন? তুই কিছু আন্দাজ করতে পারলি?'

'কে জানে, চাকরি টাকরির খোঁজে হয়তো।'

আমি গলার নিচে হাসলাম।

'তোর যেমন বুদ্ধি। বেশ্যা আবার চাকরি করতে আসবে নাকি?'

তারাচাঁদ কথাটা চিন্তা করছিল।

'আমার মনে হয় মিঃ রায়ের সঙ্গে ওর জানাশোনা আছে।' তারাচাঁদের পাঁজরে কনুই দিয়ে আর একটা গুঁতো দিলাম। 'মিঃ রায়ের বৌ মরে গেছে, জানিস তো, আমার মনে হয় ওখানে তাঁর বেশ নিয়মমত যাওয়া আসা আছে।'

'কি জানি, আমি বলতে পারব না। চোখে,যখন দেখিনি, কানেও শুনিনি, তখন কেমন করে রায়বাবুর বদনাম করব।'

'ধ্যেৎ ব্যাটা—এর মধ্যে বদনাম সুনামের আছে কি—যার পয়সা আছে সে যাবে—যার নেই যাবে না, আমিও তো যাচ্ছি—না, বলছিলাম, তোর কি মনে হয় না মিঃ রায়—'

কথা বলছিল না তারাচাঁদ। ফ্যালফ্যাল করে আমাকে দেখছিল।

'সোমবার।' আলোচনাটা সেখানেই শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম।

'আমার মনে আছে।' তারাচাঁদ উঠে দাঁড়াল। দোকানের বিল চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম।

॥ কুড়ি ॥

আমার মন কালো। তাই পৃথিবীর অন্ধকার দিকটাই দেখছিলাম। তাই সেই অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে আমার এত উৎসাহ, আগ্রহ। কদিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম মিঃ রায়ের টেবিলের টানার ভিতর একটা রিষ্টওয়াচ পড়ে আছে, দম দিলে চলে, ওপরের কাচ কাঁটাও ঠিক আছে, একটু মলিন হয়ে আছে, ব্যবহার না করলে যা হয়, বেশ চমৎকার ঘড়ি। বড় কোম্পানীর ঘড়ি।

মিঃ রায়ের হাতে আর একটা ঘড়ি দেখতাম।

তখন চিন্তা করতাম টানার ভিতর যেটা পড়ে আছে সেটা নিশ্চয় তিনি আগে ব্যবহার করতেন। এখন নতুনটা পরছেন তো পরেই আছেন।

তবে পুরোনোটা তিনি বিক্রী করে দেননি কেন সময় সময় চিন্তা করতাম।

আবার এ-ও চিন্তা করেছি, একটা ঘড়ি তাঁর থাকতে হবে তার কি মানে আছে। তবে তো তিনি এক জোড়া জুতো পরতে পারতেন। চার পাঁচ জোড়া জুতো কেন ঘরে। যদিও সব কটাই একসঙ্গে ব্যবহার করেন না। এর মধ্যে একজোড়া জুতো আমার পায়ে লাগলে তিনি সেটা আমায় দিয়ে দিয়েছেন। তেমনি তাঁর পুরোনো, পুরোনো কি নতুন জানি না, তবে আমি দেখছিলাম বেশ নতুন, এবং বেশ ভাল লেখা হচ্ছিল, একটি পেন আমায় তিনি দিয়ে দিয়েছেন। সেই ফাউণ্টেন পেন পকেটে নিয়ে আমি যুগভেরী অফিসে যাই। এসেন্সের শিশি বার করতে গিয়ে যেদিন একটা খামের ভিতর চল্লিশটা সুন্দর ফটো দেখলাম ঠিক সেদিন থেকে

খামের পাশে শুইয়ে রাখা চমৎকার রিষ্টওয়াচটাও আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল।

আশা করেছিলাম, হয়তো তিনি সেটা আমায় পরতে বলবেন। যেমন তাঁর জুতো পরছি, ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করছি, তাঁর সাবান তেল ব্যবহার করছি। একমাত্র গামছা ও তাঁর বিছানা ছাড়া সবকিছুই তো আমি এভাবে সেভাবে ব্যবহার করছি। কিন্তু রিষ্টওয়াচের কথা তিনি বলেন নি। তাই আমি ভাবছি ওটার কথা তিনি একেবারে ভুলে আছেন। খুব স্বাভাবিক। ঘরে কত জিনিস থাকে। সব কিছুর কথা কি আর একসঙ্গে লোকে মনে রাখে? তা হলে একটা জিনিস যদি চুরি হয় তো ছমাস ন'মাস পরে কেন সেটা ধরা পড়ে—তখন খেয়াল হয়, আমার অমুক জিনিসটা ছিল, সেটা দেখছি না। প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটতে শোনা যায়।

সেদিন ঘরে ফিরে আমি আর দ্বিধা করলাম না। টানার ভিতর থেকে ঘড়িটা তুলে আনলাম। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। ঘড়িটা পকেটে পুরে দরজায় তালা ঝুলিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। না, কোন দোকানে ঢুকলাম না। একটা লোক রাস্তায় ঘুরে পুরোনো ফাউণ্টেন পেন বিক্রী করত। বিক্রী করত, আবার কেউ যদি পেন বিক্রী করতে চাইত তো সে তা কিনে নিত। চমৎকার ব্যবসা। আমি জানতাম যদি তার কাছে ঘড়িটা বেচতে চাই তো সে সেটাও কিনে নেবে। তাই হল। চল্লিশ টাকা চেয়েছিলাম। তিনটা দশ টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিল। এক মিনিটের মধ্যে বেচা কেনার কাজ শেষ হয়ে গেল। নোটগুলো কোমরে গুঁজে আমি সোজা ঘরে ফিরে এলাম। মিঃ রায় তখনও ফেরেন নি। তিনি রাত্রে আর ফিরলেনই না। তাঁর ফেরা না ফেরা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতাম না। বরং সে-রাত্রে তাঁকে ঘরে অনুপস্থিত দেখে আমি যেন শান্তি পেলাম। টাকাটা সাবধানে লুকিয়ে রেখে শুয়ে পড়েছিলাম।

আমি অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর। যাঁকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করি ভালবাসি, যাঁর স্নেহ হৃদয়ের তাপ আমি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি, তাঁর মনের আনাচে কানাচে এতটুকু অন্ধকার জমে আছে কিনা জানতে এত উৎসাহ বোধ করব কেন ? কারণ আছে। আমি যে দুই চোখে অন্ধকার নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছি। অথচ আমার দুটি চোখ সারাক্ষণ আলোয় ভরে থাকত। একজন ভরিয়ে রেখেছিল। সেই আলো দেখতে দেখতে পাখির গান শুনতে শুনতে আমি একটি মুখের স্তব করেছি। রেখার মুখ। মামার প্রতিবেশী আনন্দ দত্তর মেয়ে। ক্লাশ নাইনে উঠেছিল না ? যেন আজ আর ভাল মনে নেই। কেননা একটু একটু করে এখন সব ভুলে যাচ্ছি। ভুলে যেতে এখানে চলে এসেছি। নৈহাটী গিয়ে ওর পড়ার সব কটা টেক্সট বই আমি কিনে এনেছিলাম। যত্ন করে প্রত্যেকটা বইয়ের মলাট লাগিয়ে দিয়েছিলাম। মলাটের ওপর ওর নাম লিখে দিয়েছিলাম। যেন আরো কি কি করেছিলাম। মামার ছেলের মুখে ভাতের বাজার করতে কলকাতায় এসে মামার চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটা দোকান থেকে এক জোড়া পাথরের দুল ওর জন্য কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। কবিতা পড়ে মানুষ যেমন আনন্দ পায়, সেদিন বিকেলে আনন্দ দত্তর বাগানের অতসী ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রেখার কানে পাথরের দুল পরিয়ে দিয়ে সেই আনন্দ পেয়েছিলাম। কবিতা গান স্বপ্ন সন্ধ্যাতারার ঝিকিমিকি গোধূলির আলো পাখির পালকের রং আর রেখার মুখ আমি, এক করে দেখেছিলাম। দেখতে দেখতে চলছিলাম। ও ক্লাশ টেনে উঠল। আমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে ঢুকলাম। অবশ্য খরচের অভাবে আমার পড়া আর হয়নি। চাকরিতে ঢুকলাম। কিন্তু তা হলেও আমার কবিতাকে আমি নষ্ট হতে দেইনি। গেঞ্জির কারখানায় ঢুকেছিলাম বলে কি আমার চোখের রং মুছে গিয়েছিল ? কিন্তু এর মধ্যেই রেখা হঠাৎ সেই রং মুছে দিল। ঠিক বুঝলাম না কেমন করে কি হয়ে গেল।

কদিন ধরে রেখা শ্যামনগর নেই। বেড়াতে গেছে। মাসির বাড়ি গেছে, পিসির বাড়ি গেছে, কলকাতা গেছে, বর্ধমান গেছে—ছোট কাকার কাছে ক'মাস থাকবে এখন। অনেক কথা শুনলাম। যেন কেউ ঠিক করে কিছু বলছে না বা বলতে পারছে না। আনন্দ দত্তর বাগানের অতসী ঝোপের পাশে অন্ধকার জমত, ঝিঁঝি ডাকত আর শূন্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতর হু হু করে উঠত। এমন তো কথা ছিল না। রেখা কোথাও যাবে, আমায় বলে যাবে, আমাকেই তো আগে বলবে। আর আমিই সব চেয়ে বেশি অন্ধকারে থেকে গেলাম। মন খারাপ করে পরেশের কাছে চলে যেতাম। পরেশ আমায় কতদিন প্রশ্ন করেছে, তোর হল কি। কিছু বলতাম না। চুপ করে থাকতাম। শেষ দিনও পরেশের দোকানে বসে চা খেয়ে এসেছি। কিন্তু কোন কথাই তাকে বলা হয়নি, বলা যায় না যে। পৃথিবীর কাউকে যে কথা বলা যায় না, কলকাতায় চলে আসার মাত্র দিন দশ বারো আগে মামীমার কাছে থেকে সে কথা আমি জানতে পেরেছিলাম। আর তখনই আমি মন স্থির করে ফেললাম। সেদিনই ব্যারাকপুর গিয়ে জানিয়ে দিলাম আমি আর চাকরি করব না। তারপর কলকাতা চলে এলাম। শ্যামনগরের আকাশ মাটি আর কোন দিন দেখব না প্রতিজ্ঞা করে এখানে চলে এসেছি। আমার চোখের রং মুছে গেছে, আলো নিভে গেছে। চাপ চাপ অন্ধকার ছাড়া আমার সামনে কিছু নেই।

সেজন্যই কি এখন অন্ধকারের দিকে হাত বাড়াতে এত উৎসাহ, অন্ধকার দেখতে এত লোভ!

অন্ধকার দেখব বলে মিঃ রায়ের ঘড়ি চুরি করে টাকা জোগাড় করে ফেললাম।

মনে মনে ভাবি, একজন আমার জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে, যেন তার ওপর প্রতিশোধ নিতে কোথায় আরো গাঢ়, গূঢ় অন্ধকার সেখানে ঝাঁপ দিতে ছুটে চলেছি।

সোমবার বিকেল পর্যন্ত ছটফট করছিলাম। তার পর তারাচাঁদ আমায় বাড়িটা দেখিয়ে দিতে নিশ্চিন্ত হলাম।

ভেবেছিলাম খুব একটা বড় জমকালো বাড়ি। তা না। কেমন যেন নোনা ধরা, পুরোনো বাড়ি। অবশ্য দোতলা। নিচের তলার ঘরগুলির নিতান্তই দরিদ্র অসহায় চেহারা। সামনের সারির সব কটা ঘরে একটা না একটা কিছুর দোকান খোলা হয়েছে। পানের দোকান, তেলেভাজার দোকান, মুড়ি মুড়কি বাতাসার দোকান। পান সিগারেটের দোকানটাই যা জমকালো। ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। বাকি আর কটা দোকানে কেরোসিনের লাল বাতি টিম্‌টিম্‌ করছে। যেন একটা হোটেলও রয়েছে। ডিল্যুক্স-এর মতন বড় হোটেল না। শ্রীকালী হোটেল। টিনের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল।

কিন্তু ওপর তলার চেহারাটা ভদ্র। ওপরের ঘরগুলির প্রত্যেকটাতে চড়া আলো জ্বলছে। সবকটা ঘরের দরজা জানালা যে খোলা তা না। কোন কোনটার শুধু জানালা বা জানালার একটা পাল্লা খোলা। কোন ঘরের জানালা বন্ধ, দরজাটা হাঁ করে আছে। কোণের দিকের দুটো ঘরে যেন নীল আলো জ্বলছিল।

তারাচাঁদ চলে গেল। কষ্ট করে বাড়িটা আমায় দেখিয়ে দিতে এসেছিল বলে আজও তাকে রেস্টুরেণ্টে ভাল করে খাইয়ে দিয়েছি। যাবার সময় এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিয়েছি।

তারাচাঁদ চলে যেতে বাড়ির গেট-এর দিকে একটু একটু করে এগোতে আরম্ভ করলাম।

ভয় ছিল দারোয়ান টারোয়ান বসে আছে। কাকে চান কত নম্বর ঘরে যাবেন জিজ্ঞাসা টিজ্ঞাসা করবে।

কিন্তু সেরকম কিছু দেখলাম না। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে খুশি মতন লোক উঠে যাচ্ছে নেমে আসছে।

একটা লোক এতগুলি বেলফুলের মালা হাতে ঝুলিয়ে নিচে নেমে এল, যেন মালা বেচতে সে ওপরে গিয়েছিল। ফুলওয়ালার পিছনে

আর একজন নেমে এল। দেখে মনে হল ভদ্রলোক। জামা জুতো পরা। হাতে ঘড়ি। কিন্তু পা দুটো টলছিল। দেওয়াল ধরে ধরে নিচে নামছিল। যখন আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল টের পেলাম ভদ্রলোকের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। মদের গন্ধ আমি চিনতাম। গ্যাঞ্জেস হোসিয়ারীতে আমাদের সঙ্গে সুবল কাজ করত। সুবল মদ খেত। দিশী মদ। ভদ্রলোকের নাক মুখ দিয়ে অবিকল সেই গন্ধ বেরোচ্ছিল।

আমি এক ধাপ সিঁড়ি ভেঙেছি কি আমার পিছন থেকে দুটো ছেলে, মনে হল আমার বয়সী, ভারি ফিটফাট দেখতে, শিস দিতে দিতে একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরে উঠে গেল।

আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙছিলাম। আমি নতুন। কলকাতা শহরের একটা খারাপ বাড়িতে একটা খারাপ মেয়ের কাছে এই প্রথম যাচ্ছি। কিন্তু তা বলে আমার পা কাঁপছিল না। বরং বলা চলে সবকিছু দেখতে দেখতে নানা রকম গল্প শুনতে শুনতে আমি ধীর স্থির পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম। যত ওপরে উঠছিলাম নানারকম শব্দ কানে ভেসে আসছিল। মেয়ের গলার হাসি, পুরুষের গলার হাসি,যেন কে হার্মোনিয়ামের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আস্তে আস্তে গান গাইছিল। আবার শুনছিলাম কোন ঘরে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। মেয়েলী গলা। নিশ্চয় কোন মেয়ে মায়ের কাছে ফিরে যেতে কাঁদছে। খারাপ পথে এলেও কোন কোন মেয়ে ফিরে যেতে চায়। কথাটা আমি সুবলের মুখেই শুনেছিলাম। কিন্তু ফিরে যাবার পথ থাকে না বলে তারা সময় সময় কাঁদে। মদ খেয়ে কাঁদে, মদ না খেয়ে কাঁদে। গ্যাঞ্জেস হোসিয়ারীর সুবল পাকা ছেলে। তার সবকিছু দেখা হয়ে গিয়েছিল জানা হয়ে গিয়েছিল। সুবলকে দেখে তার কথাবার্তা শুনে ভাবতাম সে কেন মদ খায় খারাপ জায়গায় যায়। নিজেকে তখন কত শুদ্ধ পবিত্র মনে হত। বস্তুত তারাচাঁদের সঙ্গে যদি আমার দেখা না হত তবে আজও বোধকরি আমি শুদ্ধ

পবিত্র থেকে যেতাম। চোখের সামনে তাল তাল অন্ধকার নিয়ে এই কলকাতা শহরেও বসে বসে কাঁদতাম। কিন্তু কাঁদব না প্রতিজ্ঞা করে তো এখানে চলে এসেছি। কাঁদতে না হয় সেজন্য তারাচাঁদকে বলে কয়ে এই মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের বাড়িটা চিনে নিলাম। না, আরো কারণ ছিল। আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার। আশ্চর্য খবর অপ্রত্যাশিত সব খবর ও ঘটনা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাচ্ছি না। খবরের মত খবর জোগাড় করতে পারছি না বলে যুগভেরীর রিপোর্টার হারানবাবু অলকবাবু আমাকে একটা রিপোর্টারের মধ্যেই গণ্য করছেন না। আমি রাস্তার জল মোটর অ্যাকসিডেন্ট বাসের চাকার তলায় সাপ ব্যাং থেঁতলে যাওয়ার খবর কুড়িয়ে সন্তুষ্ট। তাঁরা আমায় ঠাট্টা করেন।

কিন্তু আমি যে একটা প্রকাণ্ড খবর একটা ভয়ংকর সংবাদের মুখ চেয়ে বসে আছি, সুযোগের অপেক্ষা করছি, হারানবাবুদের তা আর বলতে পারছিলাম কই। তা ছাড়া আগেভাগে বলে লাভ কি।

হারানবাবু অলকবাবু রণধীরবাবু, এমন কি চাঞ্চল্যকর খবরের প্রতি যার ঘোর বিতৃষ্ণা সেই সিদ্ধেশ্বরও যাতে চমকে ওঠেন, যুগভেরীর পৃষ্ঠায় ছাপা হয়ে বেরোলে খবরটা পড়ে হতভম্ব হয়ে যান আমার লক্ষ্য সেদিকে। অন্ধকার ছেঁকে সেই খবর বার করতে চাইছি। হারানবাবুর কথা মতন ভয়ংকর খবরের সঙ্গে মেয়েছেলে জড়িত থাকবে, আমিও তাই আশংকা করছি। আর আমার খুব ইচ্ছা, যেহেতু আমার মন অন্ধকারে ছেয়ে আছে, আমার পরম হিতৈষী, আমার আশ্রয়দাতা, যাঁকে আমি এবং আমার মতন সাকুরার সেই বুড়ো কর্মচারীটা দেবতা বলে মনে করছে সেই চমৎকার সুন্দর মানুষ মিঃ রায়ও এই খবরের একজন, একটা চরিত্র হয়ে থাকবেন। না হলে আর অপ্রত্যাশিত খবর কি! আমার মন বিকৃত হয়ে গেছে বলে আমি বিকৃতি দেখতে চাইছি।

অন্ধকার সামনে নিয়ে বোকার মতন না কেঁদে অন্ধকার নিয়ে খেলা করা যায় কিনা এখন আমার ঝোঁক চেপেছে সেদিকে। বোঝা যায় কলকাতা শহরে থেকে কদিনে সাবালক হয়ে উঠেছি। তার ওপর কাগজের রিপোর্টার হয়েছি। আর আমার কানের কাছে হারানবাবু খগেনবাবু অলকবাবুরা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা চাঞ্চল্যকর সংবাদ রোমহর্ষক ঘটনা গুঞ্জন করছে।

॥ একুশ ॥

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

আমায় দেখে ও চৌকাঠের কাছে সরে এল।

'ভিতরে আসুন।' নরম থুতনিটা বুকের কাছে ঠেকিয়ে অন্তরঙ্গ গলায় ও আমায় ডাকছিল।

কিন্তু আমি নড়ছি না।

অবশ্য আমি যে একটা নির্দিষ্ট ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতে পেরেছি সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। কেননা ওপরে উঠে বারান্দার এমাথা থেকে ওমাথা দুবার পায়চারী করে পরে এই দরজার সামনে দাঁড়িয়েছি, সেই মুখ চিনতে পেরে দাঁড়িয়েছি।

আমায় সে চিনতে পারেনি।

তা হলে সেদিন যুগভেরী অফিসে ঢুকে আমায় দেখে যে বোবা হয়েছিল সে এখন এখানে দেখামাত্র আমাকে এমন করে ডাকত না। ডাকতে পারত না।

ওর পা টলছিল।

ও যে মদ খেয়েছে বেশ বোঝা যাচ্ছিল। একটা বোতল, দুটো কাচের গেলাস মেঝেয় গড়াচ্ছে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল হয়তো এইমাত্র যে ভদ্রলোক নিচে নেমে গেল সে এই ঘর থেকে বেরিয়েছে। লোকটার পা টলছিল। দেওয়াল ধরে ধরে সিঁড়ি ভাঙ্গছিল।

'আসুন না, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?'

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রূপ দেখছিলাম। সেদিন শুধু মুখ ও চুলের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। আজ আমি ওর শরীর দেখলাম। সায়া ও কাঁচুলি ছাড়া আর কোন আবরণ ছিল না,

তাই শরীরের প্রত্যেকটি রেখা বাঁক, মুখের মতন পেট বুক পাঁজরের আশ্চর্য রং ও লাবণ্য আমার চোখের সামনে ফুটে রয়েছে। যেন একটা ফুল সব কটা পাপড়ি মেলে ধরেছে। আহা, যদি এখানে এই অবস্থায় ওকে না দেখতাম, যদি ওর পা দুটো এমন করে না টলত!

'কি হল!' মেয়েটি হাসল। 'বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু রূপ দেখে চলে যাবেন। ভেতরে আসুন।' ও আর এক পা এগিয়ে এল। যেন আমায় ছোঁবে। আমি এক পা পিছিয়ে দাঁড়ালাম। খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি।

'ভয় পাচ্ছেন কেন? না, কি ভেবেছেন সব মধু আর একজন লুটে নিয়ে গেছে। আপনাকে কিছুই দিতে পারব না। এই তো?'

আমি ঘামছিলাম। কান দুটো গরম হয়ে উঠছিল। হাত দিয়ে টেনে সায়াটা আর একটু ঢিলে করে দিল ও। যেন ওই আবরণটুকুও অস্বস্তিকর লাগছিল। এখন ওর ছোট নাভিটা উঁকি দিয়েছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। এবার আমি ভয় পেলাম। আমি কাগজের রিপোর্টার। একটা আশ্চর্য খবর উদ্ধার করব বলে এখানে ছুটে এসেছি। কিন্তু মনে হয় যেন আমি তলিয়ে যাচ্ছি, ওই রূপের অন্ধকার আমায় ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। অন্ধকার নিয়ে খেলা করব বলে মনে যে অহংকার ছিল তা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে আর কোনদিনই ফিরে যেতে পারব না।

একবার মনে হল আমি তো তাই চাইছি। একজনের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্থান কাল ও মানুষের ব্যবধানটা চোখের সামনে দাঁত মেলে দিয়ে যেন হাসতে লাগল।

রেখা স্কুলে পড়ত। আনন্দ দত্তর মেয়ে। মানসম্ভ্রম বংশমর্যাদা নিয়ে উজ্জ্বল একটি মেয়ে।

আর এ তো বেশ্যা। হয়তো বেশ্যার মেয়ে।

চিরকালই বেশ্যা আছে ও থাকবে।

রেখার নিষ্ঠুরতার হৃদয়হীনতার প্রতিশোধ নিতে আমি এখানে ছুটে এসেছি, যদি কোনদিন কানে যায় তো রেখা ঠোঁট টিপে হাসবে।

আমার সব উৎসাহ কেমন যেন নিভে গেল। অবসাদ বোধ করছিলাম। 'ভিতরে আসুন।' এবার ও আমার হাত ধরল।

এতক্ষণ বারান্দার অস্পষ্ট আলোয় আমি দাঁড়িয়েছিলাম। এখন ঘরের ভিতরে চড়া আলোয় ও আমার মুখটা ভাল করে দেখল। দেখতে দেখতে ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ছুরির ফলার মতো চকচকে চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে এল। আস্তে আস্তে বসে পড়ল ও।

মেঝের ওপর ধবধবে বিছানা পাতা।

একপাশে ড্রেসিং টেবিল। নতুন। চকচক করছে। আলমারীটা নতুন। কাচের ওধারে পেয়ালা পিরিচগুলি ঝকঝক করছে। ফুলদানীতে কাগজের ফুল। সবই নতুন—যেন নতুন ঘর সাজিয়েছে।

আমায় দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে দুআঙুল দিয়ে কপালের রগ দুটো টিপে ধরল ও। যেন মাথা ধরেছে। শ্রান্ত অবসন্ন। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছে। যেন অতীতে কথা মনে পড়েছে। যেন অতীতের অনেক কথা ভুলে ছিল। এখন একটু একটু করে মনে পড়ছে। যেন আমার মুখ দেখে একটি মুখ মনে পড়েছে। ও বোবা হয়ে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে আমার চোখের রং দেখছে।

'কি হল!' আমি আস্তে বললাম।

এতক্ষণ ওর পা টলছিল। এখন মাথাটা দুলছিল। যুগভেরী অফিসে মাথায় খোঁপা ছিল। এখন একটা বেণী পিঠের ওপর লুটোচ্ছে। সাদা ধবধবে কাঁচুলি। যেন সন্ধ্যায় পাট ভেঙ্গে বুকে বেঁধেছে। মিঃ রায়ের সাদা ধবধবে রুমালের কথা আমার মনে পড়ল। একেলারটা ওবেলায় ব্যবহার করেন না। যেন এ-ও

এবেলার কাঁচুলী ওবেলা পরে না। দুধের সরের মতো কাঁচুলিটা বুকে লেগে আছে। যেন সর দিয়ে দুটো স্তন ঢেকে রেখেছে। কাঁচুলির ফিতা ডিঙ্গিয়ে লম্বা কুচকুচে বেণীটা কোমরের কাছে নেমে গেছে। যেন সায়াটা এখন আরো ঢিলে করে দিয়েছে ও। অথবা আপনা থেকে ওটা ঢিলে হয়ে ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কোমরের নিচের দিকের চামড়া আরো চকচকে নরম সুন্দর। মনে হচ্ছিল মাংসটা একজায়গায় জমে আছে বলে নাভিটা আর দেখা যাচ্ছে না। মাংসের ভিতর ডুবে গেছে। সেদিন ওর পিছনটা দেখে হঠাৎ বয়সটার গোলমাল করে ফেলেছিলাম। আজ আর তা হল না। হাত কোমর পা পিঠ কাঁধ এত পরিষ্কার করে সেদিন দেখতে পাইনি বলে ভুল করে ফেলেছিলাম। এখন মনে হল রেখার বয়সের আর একটি মেয়ে। যেন ও-ও স্কুলে পড়ে। পড়ত। বাঁ হাতের দু আঙুলে কপালটা টিপে ধরে এমন ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, দেখে মনে হল স্কুলের মেয়েটি বাবা কি মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে চুপ করে বসে আছে, অসহায় চোখে আমায় বার বার দেখছে। যেন অপরাধের কথা আমার কাছে বলে শান্তি পাবে। আমি ওকে সান্ত্বনা দেব। যেমন রেখা কোন অপরাধ করে বাড়িতে বকুনি খেয়ে সময় সময় আমার কাছে চলে আসত আর আমি ওকে সান্ত্বনা দিতাম। অপরাধ! হঠাৎ কেমন হাসি পেল। তারপর আনন্দবাবুর মেয়ে যে অপরাধ করেছিল তার জন্য বাবা মা কি বলেছিল জানি না। কিন্তু সান্ত্বনা পেতে আমার কাছে আর আসেনি। বা সেই অপরাধ করে চেহারাটা কেমন হয়েছিল আমাকে দেখাতে চায়নি।

'তুমি এমন করে আমায় দেখছ, যেন একদিন পরিচয় ছিল। বা আমার মতন কেউ দেখতে ছিল। সে নেই। বা তুমি তার কাছ থেকে চলে এসেছ।'

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কপাল থেকে হাতটা নামাল।

তারপর মদের বোতলটার দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু ওটায় আর কিছু নেই ভেবে হাতটা গুটিয়ে কোলের ওপর রাখল।

'তুমি কথা বলো।' আমি আবার বললাম। 'ভেতরে ডেকে আনলে। তারপর চুপ করে আছো। মনে হচ্ছে আমায় দেখে তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।'

এতক্ষণ মাথাটা দুলছিল বেণীটা নড়ছিল। এখন স্থির। একটা পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল ওকে।

'আমি কি চলে যাব।' অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

আবার কপালের ওপর হাত উঠল ওর। মেঝের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে ঘাড়টা একদিকে কাত করল।

চমকে উঠলাম। হঠাৎ এই অনিচ্ছা!

যেন বাধা পেলাম। আঘাত পেলাম। আহত হয়ে ওর কোমরের দিকের নরম সাদা মাংসের ঢেউ খেলানো সুন্দর বাঁকটা দেখতে লাগলাম। লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে আমি ওর সবটা শরীর দেখতে লাগলাম। টেবিলে সাজিয়ে রাখা খাদ্যের দিকে কুকুর যেমন তাকিয়ে থাকে।

আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হল এ তো রেখা নয়। স্কুলের মেয়ে নয়। বেশ্যা।

সে আমায় এমন করে ফিরিয়ে দেবে!

'তুমি আমায় চলে যেতে বলছ কেন।'

ওর ডান হাতটা মুঠোর ভিতর চেপে ধরলাম।

বাঁ হাত তখনো কপালে ঠেকানো। আর সেই হাতের ফাঁক দিয়ে আবার ও আমায় দেখছে। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে যেমন করে মানুষ আকাশ দেখে মেঘ দেখে। দেখতে দেখতে ওর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল।

আমার হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেল। ওর হাত ছেড়ে দিলাম।

'তুমি কাঁদছ ?' ওর মাথায় হাত রাখলাম। রেখার মাথায় এভাবে হাত রেখেছিলাম একদিন। যেন আবার আমি ভুলতে বসলাম, মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের একটা খারাপ বাড়িতে ঢুকে একটা বাজে মেয়েকে না, একটা বেশ্যাকে না, আমার হৃদয়ের কাছে রয়েছে, যার চুল দেখে চোখ দেখে আমি নিজেকে পবিত্র মনে করি, যাকে সান্ত্বনা জানিয়ে আদর জানিয়ে আমি আমাকে ঈশ্বরের মতো মহৎ ও সুন্দর মনে করি, এমন একটি মেয়েকে আমি আদর করছি সান্ত্বনা দিচ্ছি।

কপাল থেকে হাত নামিয়ে সেই হাতের পিঠ দিয়ে ও চোখ মুছল।

আমি চুপ করে রইলাম।

অন্য সব ঘরে নানারকম শব্দ হচ্ছিল। যেন কেউ হাসছে, কেউ গান গাইছে, কার হাত থেকে যেন কাচের গেলাস ছিটকে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে সারা মেঝেয় ছড়িয়ে গেল। কেবল এই ঘর নীরব।

চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার নতুন ড্রেসিং টেবিল আয়না আলমারী কাগজের ফুল দুধের মতন ধবধবে বিছানাটা দেখলাম।

'আমি কি চলে যাব ?'

ও ঘাড় কাত করল।

'তুমি কাল এসো।'

চমকে উঠলাম। একটু আগে আপনি ছিলাম। হঠাৎ তুমি হয়ে গেলাম। ভুরু কুঁচকে ভাবলাম। আদরের তুমি, কি উপেক্ষার তুমি ঠিক করতে না পেরে মাথাটা একটু গরম হয়ে উঠল। তাই ইচ্ছা করে গলার স্বরটা রুক্ষ করে ফেললাম।

'কেন, কাল কেন ?'

'কাল এসো।'

নতুন করে আমার জিদ চাপছিল।

'আমি সঙ্গে টাকা নিয়ে এসেছি।' আবার ওর শরীর ধরতে চেষ্টা করলাম। আর, এক চোখ দিয়ে মেঝেয় পাতা চমৎকার বিছানাটা

ও অন্য চোখ দিয়ে ওর শরীর দেখছি, এমন করে আমি তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলাম।

'হঠাৎ টাকার কথা তুলছ তুমি ?' আঘাত পেয়েছে এমন করে আমার দিকে তাকায় ও।

'বা রে টাকা ছাড়া তুমি তোমার শরীর ধরতে দেবে কেন।' মনে মনে বললাম, তুমি রেখা নও। আমি রেখার শরীর ধরেছিলাম। একদিন ধরেছিলাম। ওর স্তন দুটো মুঠো করে ধরে আদর করেছিলাম। এই জন্যই আজ আমি রেখাকে মনে মনে ঘৃণা করছি। ওর শরীরের কথা মনে হলে আমার গা ঘিন ঘিন করে। কেননা শুধু মন না, শরীর ও মন দুটো দিয়েই আমার সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারপর মুখ দেখাতে না পেরে পালিয়ে গেছে।

কিন্তু তুমি তা করবে না, এই মেয়েটার শরীরের ওপর চোখ রেখে মনে মনে বললাম, তোমার মন বলে কিছু নেই। বেশ্যার মন থাকে না। শরীর নিয়ে কারবার। টাকার বিনিময়ে তুমি তোমার শরীর আমায় ধরতে দেবে। একে কি আদর বলব। তুমি পুরুষের আদর চাও না। আমিও তোমার কাছে তা আশা করি না। কেবল একটু সময়ের জন্য তোমার দেহ উপভোগ করা। একটু পরে তুমিও ভুলে যাবে আমিও ভুলে যাব। কেননা আমাদের মধ্যে প্রেম নেই ভালবাসাবাসির খেলা নেই। আমার ও রেখার মধ্যে যা হয়েছিল বা হতে চলেছিল। যার জন্য তার উপর আমার এত বিদ্বেষ এত বিতৃষ্ণা।

'কি, কথাটা ঠিক কিনা ?' ওর হাত ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দিলাম। যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে চোখ বুজে ভাবছিল। ঝাঁকুনি খেয়ে ও চোখ খুলল।'

'টাকা লাগবে না। তুমি এম্নি আমাকে—'

'কেন।' অবাক হলাম। শব্দ করে হাসলাম। 'তুমি কি

কুমারী—স্কুলের মেয়ে? প্রথম পুরুষস্পর্শ পাবে বলে শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। বড় যে টাকাটা কিছুই না করে দেখছ।' একটু থেমে বললাম 'না কি এ লাইনে এসে নতুন করে ভালবাসাবাসির খেলা খেলতে ইচ্ছে করছে।' ছোট্ট করে আমি ওর গাল টিপে দিলাম।

আমার শরীর মন কিন্তু তেমন একটা ঘিনঘিন করে উঠল না ওকে গাল টিপে দিয়ে।

আমার মনে হল রেখার চেয়ে এই মেয়েটি ভাল। বেশ্যা হয়েও আনন্দ দত্তর মেয়ের চেয়ে পবিত্র। যেন খবরের কাগজে খবরটা ছেপে দিতে পারলে আমি খুশ হতাম।

'কাল কাল করছ।' বিমর্ষ গলায় বললাম, 'কাল আমি গাড়ি চাপা পড়তে পারি—এখান থেকে বেরোবার সময় গুণ্ডারা ছুরি মারতে পারে। বা এটা তোমাদের পুরোনো বাড়ি। কাল এসে দেখব ছাদ কি বারান্দা ধ্বসে তোমার একটা কিছু হয়ে গেছে—তোমার ও এবাড়ির আরো অনেকের। আর কটি মেয়ে আছে এখানে?'

'চৌদ্দটি।'

'কাল অনেক দূর।' আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম। একটু চাপ দিলাম। হাত বসে গেল না, কেননা হাত কি আঙুল বসে যাওয়ার মতন বাজে বাড়তি মাংস ওর শরীরে নেই। বরং আমার হাতটা যেন পিছলে পড়তে চাইছিল ওর কাঁধের ওপর থেকে, এত মসৃন মোলায়েম চামড়া। সিল্কের মত নরম শরীর। খুব একটা চাপ দিতেও ইচ্ছা হল না। ওইটুকুন স্পর্শে আমার হাত সিরসির করছিল।

আবার একটু একটু করে ওর চোখ জলে ভরে উঠল।

'হঠাৎ এমন হল কেন,' আস্তে বললাম। একটা হাঁটুর কাছে সায়াটা উঠে গেছে। আমি সেখানে হাত রাখলাম। হাঁটু এবং

সায়ার মধ্যে হাত দিয়ে ওর উরু স্পর্শ করলাম। ও আপত্তি করল না, বা আমার এমনও মনে হল, যেন ওর খেয়াল নেই আমি কি করছি। যেন গভীর কিছু চিন্তা করছিল মেয়েটা।

'হঠাৎ কাঁদছ কেন বুঝতে পারলাম না।'

'বাড়ির কথা মনে পড়ছে আমার।'

'ও, তোমার বাড়ি ছিল বুঝি।' ওর উরুর নরম মাংসে চাপ দিলাম। এবার আমার হাতটা বসে যাচ্ছিল। 'বাড়িতে তোমার কে আছে আর?'

'কেউ নেই বাড়ি ভেঙ্গে গেছে।' একটু চুপ থাকল ও তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি অবিকল আমার দাদার মতো দেখতে।'

'তোমার দাদা কোথায়?'

'মারা গেছে।'

'কি হয়েছিল?'

'ট্যাক্সি চাপা পড়েছিল।'

'এই কলকাতার রাস্তায়?'

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল। সেদিন সেই ছোট ছেলেটার ট্যাক্সি চাপা পড়ার দৃশ্যটা আমার মনে পড়ল।

'তোমার মা কোথায়?'

'বিষ খেয়ে মরেছে।'

'কেন?'

'আমার জন্য।'

চুপ করে রইলাম। উরুর ওপর থেকে হাত আপনা থেকে সরে এল। আমার হাতে ওর শরীরের ঘাম লেগেছিল। ও প্রচুর ঘামছিল। আমার ইচ্ছা করছিল রুমাল দিয়ে ওর ঘাম মুছে দিই। কিন্তু এমন কাঁদতে সুরু করেছিল ও যে ঘামের কথা ভুলে রইলাম।

'বাবা কোথায়—তোমার বাবা নেই?'

'আছে। বাবার মাথার ঠিক নেই।'

'তোমার জন্য নিশ্চয়?' মনে মনে দুঃখ হল। অবশ্য সেটা মুখ দিয়ে প্রকাশ করলাম না। আমার ভাল লাগছিল অনেক কিছু ওর সম্বন্ধে জানতেও পারছি বলে। এগুলোও খবর। অবশ্য কাগজে ছাপাবার মতন নয়। কিন্তু তা হলেও মদ খেলে বেশ্যারা যে তাদের বাড়িঘর স্বামী সংসার বাবা মা ভাই বোন নিয়ে কথা বলতে সুরু করে কাঁদতে আরম্ভ করে সুবলের কাছে শুনেছিলাম। যে জীবন ফেলে এসেছে সেই জীবনের ছবি মাঝে মাঝে ওদের হাতছানি দেয় বৈকি। কিন্তু ফিরে যাবার তো উপায় থাকে না। তাই কাঁদে।

'তোমার আর ভাই বোন নেই?'

'আছে। একটা বোন আর একটা ভাই।'

'তারা কোথায়?'

'আত্মীয়ের কাছে।'

মনে মনে বললাম স্বাভাবিক। মা সুইসাইড করেছে, দাদা গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে, বাবা পাগল হয়ে রাস্তায় ঘুরছে, ছোট ভাই বোন দুটিকে কোন আত্মীয় দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম বাবা মা ভাই বোনের সংসার থেকে এমন একটা জায়গায় ও ছিটকে এসে পড়ল কি করে কে তাকে নিয়ে এলো এ-পথে।

'ভাই বোন দুটিকে দেখতে ইচ্ছা করে না?'

ও মাথা নাড়ল। ইচ্ছা না করাই স্বাভাবিক, ভাবলাম এই মুখ নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াতে কারই বা ইচ্ছা করে।

হঠাৎ সেদিন যুগভেরী অফিসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল কেন আমার জানতে ইচ্ছা হল। না কি পাগল বাবা কোথায় আছে জানতে ইচ্ছা হয়েছিল ওর। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে চেয়েছিল? হয়তো তাই। কেউ বলে দিয়েছিল যুগভেরীর মিঃ রায়ের কাছে

যাবে। মানুষটা ভাল। তোমার বাবার ঠিকানা খুঁজে বার করতে তিনি সাহায্য করবেন। আবার ভাবলাম, না কি চাকরির জন্য মিঃ রায়ের কাছে গিয়েছিল? এই শ্রেণীর মেয়ে কোন অফিসে চাকরি করে কি? না কি ও ভেবেছিল এই পথ ছেড়ে দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক পথ বেছে নেবে জীবিকা অর্জনের। মেয়েটি কি লেখাপড়া জানে? কেমন কৌতূহল।

'তুমি অন্য কাজটাজ কর না কেন?'

'কি কাজ।'

'এই যেমন হাতের কাজ। কত মেয়ে তো সেলাই টেলাই করে পয়সা রোজগার করে, কাগজের ফুল তৈরী করে বিক্রী করে, ঠোঙ্গা বানায়, কেউ বেতের জিনিস তৈরী করে; পুতুল তৈরী করে দোকানে দেয় এমন মেয়েও শহরে অনেক আছে।'

চুপ করে রইল ও।

'হাতের কোন কাজই জানা নেই বুঝি?'

ও মাথা নাড়ল।

'ইস্কুলে কলেজে পড়েছিলে কোনদিন? না তাও না?'

'তোমার কি মনে হয়?' এই প্রথম একটুখানি হাসি দেখলাম ওর ঠোঁটে। চোখের কিনারায় জল লেগে ছিল যদিও। আমি হাল্কা গলায় হাসলাম। অনেকক্ষণ পর একটু হাল্কা বোধ করলাম।

'আমার কিছুই মনে হয় না।'

'কেবল এই? এখন যেমন দেখছ?'

'যদি তাই মনে করি?'

'যদি বলি আমি এক বছর কলেজে পড়েছিলাম।'

'পড়তে পার।' খুব একটা গায়ে মাখলাম না কথাটা। 'যদি তার পরেও তুমি এখানে এসে থাক জেনেশুনে এসেছ। খারাপ হবে বলে খারাপ পথে পা বাড়িয়েছিলে।'

'যদি বলি এই জন্য আমার বাবা দায়ী?'

'আমি বলব মিথ্যা কথা।' গলার স্বরটা আবার রুক্ষ করলাম। 'কোন বাবাই তার মেয়েকে বেশ্যা হতে বলে না।'

ও একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। এখন আর চোখে জল নেই। বরং অতিরিক্ত শুকিয়ে গিয়ে চোখ দুটি মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে।

কেমন যেন সহ্য হচ্ছিল না সেই চোখের দৃষ্টি। অন্য দিকে চোখ ফেরালাম।

'আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না?'

'না।'

'আমি একটা ভুল করে ফেলেছিলাম।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ভুল না করলে কেউ এখানে আসে!' গম্ভীর হয়ে বললাম।

'কিন্তু বাবা ক্ষমা করতে পারতেন। অনেক মেয়ে ভুল করে, কিন্তু তা বলে কি তাদের বাবা মা তাদের রাস্তায় বার করে দেন!'

চমকে উঠলাম। আনন্দ দত্তর মেয়ে রেখা ভুল করেছিল। দূর সম্পর্কের মাসতুত ভাই না কে একটা বাড়িতে আসত। জগদীশ নাম। উঃ, আমি কি করে জানব যে একটি কুমারী মেয়ে—। কিন্তু তা বলে কি আনন্দবাবু মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বরং নিজের সুনাম রাখতে কোথায় তাকে সরিয়ে রাখলেন কাক পক্ষীটি টের পেল না। তবে কি এই মেয়েটিও—

আমি ভয়ে ভয়ে তার মুখ গলা পেট জানু সবটা শরীর দেখলাম। যেন কিছু একটা আঁচ করতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরীরের প্রত্যেকটি অংশ পরীক্ষা করতে লাগলাম। ও আমার চোখ দেখছিল।

'মদ খেতে শিখলে কবে?'

'এখানে এসে।'

'এখানে কতদিন আছো।'

'নতুন এসেছি। ভাল করে সাতদিনও হয়নি।' তৎক্ষণাৎ

আমি মনে মনে হিসাব করে দেখলাম সাতদিন আগে ও যুগভেরী অফিসে গিয়েছিল।

'আগে কোথায় ছিলে?' রুমাল বার করে কপাল গলা মুছলাম। এখন আমি প্রচুর ঘামছিলাম। ও ঘামছিল কিনা আমার দেখতে ইচ্ছা করছিল না। সায়াটা হাঁটুর নিচে টেনে দিয়েছে ও। আর, যেন শাড়ি ব্লাউজ কোথায় রেখেছিল এখন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। হয়তো নেশাটা কেটে যাচ্ছে, একটুখানি মদ খেয়েছিল বুঝি। খেয়ে আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করেছিল। মদ খেলে ওরা কত কি না বলে। তা হলেও এগুলো খবর। কিন্তু খুব একটা চমকপ্রদ খবর না। যুগভেরীতে ছাপা যায় না। এ ধরনের খবর যদি ছাপব তো রেখার খবরটাও ছাপা যেত। রেখাও তো ভুল করেছিল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, যদি এখানে এই মেয়েটি না হয়ে রেখা হ'ত, এমন জায়গায় রেখাকে দেখতাম আমার খুব আনন্দ হত। আমি উল্লাসে নৃত্য করতাম।

কিন্তু রেখার বাবা আনন্দ দত্ত অনেক বেশি চতুর বুদ্ধিমান। হয়তো রেখা ইতিমধ্যে মাসি পিসির বাড়ি বেড়ানো শেষ করে শ্যামনগর ফিরে এসেছে, আবার স্কুলে যাচ্ছে; রেখা যে কোন দিন ভুল করেছিল আর চোখে মুখে শরীরে তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মুছে গেছে। আনন্দ দত্ত নিজের হাতে মেয়ের গায়ের কলঙ্কের দাগ মুছে দিয়েছেন।

'আমি এই এক বছর অনেক জায়গায় ঘুরেছি—' ইতিমধ্যে ব্লাউজ গায়ে দিয়ে শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে আমার সামনে বসল ও। কিন্তু কোথাও থাকতে পারিনি, যদি কোন আত্মীয়ের বাড়ি গেছি, বাবা চিঠি লিখে জানিয়েছে আমাকে যেন আশ্রয় দেওয়া না হয়, ক্ষমা করা না হয়।'

'নিষ্ঠুর।' অস্ফুট শব্দ করে বললাম।

ওর চোখ আবার সজল হয়ে উঠল।

'আসানসোলে একটা প্রাইমারী স্কুলে আমি মাস্টারী পেয়েছিলাম।'

'তারপর?' ঢোক গিললাম, যেন এতক্ষণ পর খবরটায় রং ধরতে আরম্ভ করেছে। মেয়েটি তা হলে একেবারে বাজে না। সুস্থভাবে বাঁচতে চেষ্টা করেছিল। 'সেখান থেকে চলে এলে কেন!' আমি ঢোক গিললাম।

'বাবা কি করে খবর পেয়ে স্কুলের কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল আমি খারাপ মেয়ে নষ্ট মেয়ে।'

'মাথা খারাপ। সত্যি তো লোকটা পাগল হয়ে গেছে।' হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। ওর নতুন কেনা ড্রেসিং টেবিলটার দিকে চোখ রেখে নিজের মনে কথাগুলি বললাম।

একটু সময় কাটল।

'তা হলে তুমি কাল এসো, কেমন।' শূন্য চোখ দুটো দেওয়ালের দিকে ধরে রেখে উদাস গলায় ও বলল, 'আজ আমার মন ভাল নেই। দাদার মতন অবিকল দেখতে—আর তাই তোমাকে এত সব বলে ফেললাম।'

'আর কাউকে কোনদিন বলেছ এসব কথা?'

'এখানে এসেছি পর থেকে এসব কথা মানুষকে শোনাতে ইচ্ছা করছে। আর ঐ পাজী জিনিসটা একটুখানি খেলেই যেন এসব বেশি মনে পড়ে।' আঙুল দিয়ে ও মদের বোতলটা দেখাল। 'একটু আগে একটা লোক এসেছিল। এসব কথা আরম্ভ করতেই লোকটা বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

'খুব স্বাভাবিক।' আস্তে বললাম।

'তারা আমার এই জীবনটাই দেখতে চায়—আমার যে একটা সুন্দর জীবন ছিল মা ছিল ভাই বোন ছিল বিশ্বাস করতে চায় না। আমি যে একটা বছর কলেজে পড়েছিলাম—'

'কিন্তু তুমি কি ঠিক করেছ এখানেই থেকে যাবে—এটাই তোমার

উপযুক্ত জায়গা ?'

'তা না হলে বাবার ওপর প্রতিশোধ নিতাম কি করে।' ও মলিন একটু হাসল। 'এখানে অবশ্য বাবা আর বাড়িউলি মাসিকে চিঠি দিয়ে বলবে না আমাকে তাড়িয়ে দিতে। কেমন তাই না ?'

আমি হাসলাম না। মাথা নেড়ে বললাম, 'না তা আর তিনি করবেন কেন। কিন্তু তোমার বাবা কি জেনে গেছেন তুমি এখানে আছ।'

'কাল চিঠি লিখে দিয়েছি।' ঠোঁটের হাসিটা আর একটু চড়িয়ে দিল ও। 'কেমন ভাল করি নি ?'

'ভাল করেছ।' মনে মনে বললাম, তুমি ভুল করেছিলে। কত মেয়ে ভুল করে। কিন্তু বাবা মা সেই ভুল সংশোধন করে দেয়। আনন্দ দত্ত মেয়ের ভুল সংশোধন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা করবার আগেই তোমার বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেল, মা আত্ম-হত্যা করল, তারপরও তুমি নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করতে গিয়ে বার বার বাধা পেয়েছ। তোমার পাগল বাবা বাধা দিয়েছে। এখন এমন একটা বাজে জায়গায় এসে উঠেছ শুনে যদি তার মাথা ঠিক হয়—যদি অনুশোচনা হয় ; কিন্তু তা কি আর হবে। উন্মাদের অনুতাপ অনুশোচনা বলে কিছু নেই।

॥ বাইশ ॥

রাস্তায় নেমে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

এমন একটা চমৎকার জায়গায় ছুটে গিয়েও তেমন কোন জোরালো খবর উদ্ধার করা গেল না।

অত্যাশ্চর্য খবরের আশায় একদিন ডিক্সন লেনে গিয়ে পরে যেমন ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম আজও তাই হল। নতুনত্ব নেই। এখানেও নিরক্ত ধূসর বিবর্ণ জীবনের ছবি দেখে আমাকে ফিরতে হল। কথা দিয়ে এসেছি কাল যাব। কিন্তু যাওয়া হবে না। কী হবে গিয়ে। হয়তো সেই একঘেয়ে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলবে। একটু একটু মদ খেতে আরম্ভ করেছে মেয়েটি। হয়তো কাল আর একটু বেশি খাবে। আর একটু বেশি কাঁদাকাটা করবে।

আমার অনুতাপ হচ্ছিল মিঃ রায়ের ঘড়িটা চুরি করার জন্য। টাকার জন্য জলের দরে রাস্তার আর একটা চোরের কাছে ওটা বেচে দিলাম। টাকাটা যদিও রয়ে গেছে খরচ হয়নি, কিন্তু তা হলেও কি আর তা দিয়ে ঘড়ি ফিরিয়ে আনা যাবে। ফিরিয়ে আনতে গেলে বলবে, বেচে দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন এসে কিনে নিয়ে গেছে। ঘড়ি পেন এসব কখনো পড়ে থাকে মশাই—পাঁচ রকম কথা শুনিয়ে দেবে। তার মানে জলের দরে ঘড়িটা সে পেয়ে গেছে। আর কখনো ছাড়ে! তখন ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলেছি। আমার ভয় হচ্ছিল মিঃ রায় না আজই টেবিলের টানা খুলে দেখেন ঘড়িটা নেই। কী মনে করবেন তিনি তখন। নিশ্চয় আমাকে সন্দেহ করবেন। তাঁর ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না।

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আমি ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম। যেন আজ কালের মধ্যে মিঃ রায় তাঁর ঘড়ির কথা জানতে না পারেন—যেমন ভুলে আছেন ভুলে থাকুন। এই ত্রিশ টাকা এবং যুগভেরীর মাইনে পেলে আর কিছু টাকা যোগ করে একটা ঘড়ি কিনে টানার ভিতর রেখে দেব। যেমনটি ছিল। নতুন হয়তো কিনতে পারব না। যুগভেরী কত মাইনে দেবে এখনো ঠিক হয়নি। মিঃ রায়কে কথাটা জিজ্ঞেস করব করব করে করা হচ্ছে না। নিশ্চয় তাঁর বন্ধু মোহিনীবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে। মিঃ রায়ের সেই পুরোনো ঘড়িটার মত পুরোনো ঘড়ি কারো কাছে পাওয়া যায় কিনা আমাকে চেষ্টা করে দেখতে হবে।

তারাচাঁদের কথা শুনে মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের ওই খারাপ মেয়েটির ঘরে যাব বলে হঠাৎ এমন কাজ করে বসব আমার ধারণা ছিল না। আজ পর্যন্ত আমি কারোর একটা পয়সা চুরি করিনি বা কাউকে এক পয়সা ঠকাইনি। নিজের ওপর তো বটেই, তারাচাঁদের ওপর রাগ হতে লাগল। যেমন আর একদিন হয়েছিল। সে বেয়ারা আছে বেয়ারা থাকত। তার সঙ্গে মিশতে গেলাম কেন ভেবে আমার নতুন করে দুঃখ হচ্ছিল। কাল অফিসে গেলে শূয়ারটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসবে। ভাববে কুড়ি পঁচিশ টাকা আমি সেখানে খরচ করে এসেছি। যদি বলি কিছুই হয়নি, আমি একটা পয়সাও খরচ করিনি, চলে এসেছি, তারাচাঁদ বিশ্বাস করবে না।

এক দিকে তারাচাঁদ অন্যদিকে মিঃ রায়ের ঘড়ি—দুটো চিন্তা এক সঙ্গে মাথার ঢুকে আমায় যেন পাগল করে তুলছিল।

ভাগ্যিস সেদিনের সেই চায়ের দোকানটা সামনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম। সেই শ্যামলা মেয়েটা আছে।

'কি খাবেন?' সেদিনের মতো মিষ্টি করে হাসল ও।

'চা।' হেসে বললাম, 'রাত হয়ে গেছে—এখন আর কী খাব। শুধু চা।'

'কোথায় রাত হল। কলকাতা শহরে আবার রাত হয় নাকি।' আজ আর শুধু মিষ্টি হাসি না, ভুরু জোড়া রামধনুর মতো বেঁকিয়ে কপালে তুলল। 'মোটে তো দশটা। একটা কেক দি।'

'তাই দাও।'

চা কেক আনতে ও চলে গেল। ওর পিছনটা দেখলাম। যেন নতুন একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। অভিজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে এই মেয়েটির শরীর দেখলাম। এই মেয়েও কি ভুল করেছিল। রেখার মতো, মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের মেয়েটির মতো এ-ও কি কুমারী অবস্থায় মা হতে চলেছিল। একেও কি বাবা মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আনন্দ দত্তর মতো যদি এর বাবা বুদ্ধিমান বিচক্ষণ না হয় তো মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের মতো এর অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো নিরুপায় হয়ে চায়ের দোকানে চাকরি করছে। না কি তলে তলে এ-ও একটি বেশ্যা। সুবল বলত, রাস্তায় ঘাটে অনেক বেশ্যা চলাফেরা করে। তুমি তাদের দেখে চিনবে না। সুবলের কথা যে মিথ্যা না আজ তার প্রমাণ পেয়ে এসেছি। সেদিন যুগভেরী অফিসে মেয়েটা যখন আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল আমি কি বুঝতে পেরেছিলাম ও একটা বাজে মেয়ে খারাপ জায়গার মেয়ে।

টেবিলে চা ও কেক রেখে দোকানের মেয়েটা যখন আবার মিষ্টি করে হাসছিল আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ওর চোখ দুটো দেখলাম। কেন জানি আমার মনে হচ্ছিল, যদি ও বেশ্যা হয়ে থাকে তবে এখন ওর চোখ দুটো যেমন সুন্দর দেখছি শরীরটা যেমন সুন্দর দেখছি তার চেয়ে ও বেশি সুন্দর। যেমন সেদিন মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের মেয়েটিকে কাগজের অফিসে একরকম দেখলাম, না সেখানেও তাকে রূপসী দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল এমন আশ্চর্য

চোখ চুল নাক ভুরু গায়ের রঙের তুলনা হয় না, কিন্তু আজ একটু আগে ওর নিজের ঘরে ওর রূপ দেখে আমার কেমন নেশা ধরে গিয়েছিল। আর তখনি আমি ওর গায়ে হাত দিলাম। লোভ সামলাতে পারি নি। ছোটবেলায় পড়েছিলাম বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মায়ের কোলে, তেমনি বেশ্যার রূপ বেশ্যালয়ে যত খোলে রাস্তায় অফিসে ট্রামে বাসে দোকানে তা খুলবে কেন।

তাই আমার বার বার মনে হচ্ছিল শ্যামলা রঙের পাতলা ছিপছিপে গড়নের এই মেয়েটাকে এখানে যা দেখছি তার চেয়ে ও ঢের বেশি সুন্দরী। শুধু সায়া ও কাঁচুলি পরে থাকলে ওর শরীরটা কেমন দেখাত আমি কল্পনা করছিলাম।

আমি আর একটা কেক চেয়ে নিলাম।

একবার ওর হাতে একটু চাপ দিয়েছিলাম।

ও খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

দোকানে আর খদ্দের ছিল না বলে ও এমন করে হাসতে পেরেছিল।

হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে অবশ্য উঠে পড়লাম। এগারোটা বাজে।

কিন্তু তা হলেও সময়টা চমৎকার কাটল। মনটা কেমন হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বিল চুকিয়ে শিস দিতে দিতে রাস্তায় নামলাম।

কিন্তু রাস্তায় নেমে আবার যে-কে-সে।

যেন আমার পায়ে কে পাথর বেঁধে দিয়েছিল। বাসস্টপের দিকে এগোতে পা উঠছিল না। মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের সেই মেয়েটির কান্না, মিঃ রায়ের ঘড়ি এবং তারাচাঁদের মিটিমিটি হাসি একসঙ্গে মনে পড়ে মনটা বিষাদে ছেয়ে গেল।

॥ তেইশ ॥

তেতলার বারান্দায় উঠতে অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে আলো জ্বলছে। তবে তো মিঃ রায় এসে গেছেন। কখন ফিরলেন তিনি! তিনি কি এইমাত্র ফিরেছেন! না কি বিকেলে ফিরেছেন। হয়তো সারা দুপুরই ঘরে ছিলেন। আশ্চর্য কি। আমি তো সেই সাড়ে বারোটায় বেরিয়ে গেছি। তাঁর কি শরীর খারাপ?

ভিতরে ঢুকতে ভয়টা কাটল।

না, শরীর খারাপ না। আরাম কেদারায় বসে আছেন। একটা কাগজ পড়ছেন। মনে হল চিঠি।

তাঁর মুখখানা হাসি হাসি।

এমনি তিনি সুপুরুষ। সবুজ ডোম পরানো টেবিল-ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলো লেগে তাঁর সুন্দর মুখখানা কেমন স্বর্গীয় হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছিল এই জগতে থেকেও তিনি এই জগতের অনেক ঊর্ধ্বে —এখানকার কুশ্রীতা অন্ধকার কোলাহল মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি, যদি কিছু পেয়ে থাকে তো এখানকার আলো সৌরভ ঔদার্য প্রীতি প্রেম। তিনি শুধু ক্ষমা করতে জানেন ভাল-বাসতে পারেন—ঘৃণা বিদ্বেষ মাৎসর্য আক্রোশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই।

আমার আর ভয় করল না, আর কোন সঙ্কোচ রইল না। তাঁর সামনে দাঁড়ালাম।

চোখ তুললেন তিনি। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে আমায় দেখলেন। হাসলেন।

'অনেক রাত করে ফেললে, বিনু।'

চুপ করে রইলাম। আমার মনে হল তিনি খুব বেশিক্ষণ ফেরেন নি। কেননা তখনো বাইরের পোষাক তাঁর গায়ে। যেন একটু আগে সাকুরা থেকে তিনি চা আনিয়ে খেয়েছেন। ফোন করে দিলেই হল। সাকুরা থেকে চা আনতে আর কি। সাকুরায় যখন টেলিফোন রয়েছে। হয়তো এত রাত করে সেই বুড়ো চা নিয়ে এসেছিল বলে মিঃ রায় বুড়োকে খুব ধমক দিয়েছেন, ধমক দিয়ে একটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়েছেন। হয়তো বুড়োকে শুধু টাকাই দিয়েছেন, ধমক দিয়েছেন সাকুরার ম্যানেজারকে—নিশ্চয় মিঃ রায় তৎক্ষণাৎ ফোন করে জানিয়েছেন, এমন জানলে তিনি চায়ের কথা বলতেন না—বুড়ো মানুষ রাত্রে চোখে কম দেখে, রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি-চাপা পড়তে কতক্ষণ, এবাড়ির এতগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গতে তার কত কষ্ট হয়, আপনাদের কি কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই—

দাঁড়িয়ে এসব ভাবছিলাম।

মিঃ রায় আমার হাতে চিঠিটা দিলেন।

'পড়ে ছাখো।'

চমকে উঠলাম। তাঁর চিঠি আমায় পড়তে বলা কেন, না কি আমার নামে চিঠি!

রুদ্ধশ্বাসে সবটা পড়ে শেষ করলাম।

একটি মেয়ে তার বাবাকে লিখেছে। অনেক কথা লিখেছে। ভুল করেছিল সে, কিন্তু বাবা তাকে ক্ষমা করে নি। আশা করেছিল সে, তার বাবার মনের প্রশস্ততা ফিরে আসবে—কিন্তু তা আর এল না, নিষ্ঠুর চিরকাল নিষ্ঠুর থেকে গেল। বাবার মনের সঙ্কীর্ণতার নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নিতে হাসতে হাসতে সে একটা ব্রথেলে চলে এসেছে। মেয়েটির নাম ইরা।

চমকে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। মিঃ রায়ের হাতে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলাম।

'আপনি কি লোকটার ঠিকানা জানেন ? ওর বাবার ? না কি যুগভেরীর চিঠির কলামে এটা ছেপে—'

'আরে না না।' মিঃ রায়ের উজ্জ্বল চোখ আরো উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে উঠল। 'ঠিকানা জানা আছে বলে তো এখানে পাঠিয়েছে।'

'উন্মাদ!' দাঁতে দাঁত চেপে চেহারাটাকে নিষ্ঠুর করে তুললাম, মিঃ রায়ের হাসি আমার ভাল লাগছিল না, বললাম, 'আমি হলে লোকটাকে গুলী করে মেরে ফেলতাম।'

'অলরেডি গুলী করে মেরে ফেলা হয়েছে, মানুষটা আর নেই।'

চুপ করে রইলাম। মুখে কথা সরছিল না। তিনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন।

'তুমি এখানে যেদিন এসেছ, আমার কাছে এসেছ সেদিন সেই পাগলটা মারা গেছে।' মিঃ রায় সোজা হয়ে বসলেন।

হাঁ করে তাকিয়ে আমি তাঁর চোখের ভিতর দেখছিলাম। অথচ সেই চোখে কোন রং ছিল না কৃত্রিমতা ছিল না কুয়াসা ছিল না কুণ্ঠা ছিল না। স্বচ্ছ দীপ্ত অমলিন—সূর্যের মতো ভাস্বর দৃষ্টি।

চিঠিটা তিনি পকেটে পুরলেন। খামটা পকেটে উঁকি দিয়ে আছে। যেন ঘরে ঢোকার সময় লেটারবক্স থেকে ওটা তুলে এনে এখানে বসে পড়ছিলেন।

হঠাৎ মিঃ রায় আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ চুপ থেকে কি যেন ভাবছিলেন। পায়চারি করলেন একটু সময়। তারপর আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'নিষ্ঠুর, ভয়ংকর নিষ্ঠুর ছিল লোকটা।' মিঃ রায় আর হাসছিলেন না, আমার উল্টোদিকের দেওয়ালে চোখ রেখে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। এখন আমার ভাল লাগল ; তিনি গম্ভীর হয়ে গেছেন, লোকটা কতখানি হৃদয়হীন ছিল মিঃ রায় এবার বোধ করি উপলব্ধি করছিলেন। 'মেয়েটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। যদি

কারো কাছে আশ্রয় পেয়েছে, ওর বাবা সেটাও সহ্য করতে পারত না।'

'তার মানে ও রাস্তায় ঘুরে বেড়াক, উন্মাদ তাই চাইছিল।' আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম।

'কলকাতার বাইরে একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছিল মেয়ে। সেখান থেকেও তাড়াবার ব্যবস্থা করেছিল ওর বাবা।'

'উঃ কী আক্রোশ—বিজাতীয় ঘৃণা!' আমি বিড়বিড় করে উঠলাম। 'তারপর?' গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'অর্থাৎ মেয়েটা ভালভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকুক পাষণ্ড সেটা চাইছিল না!'

মিঃ রায় মাথা নাড়লেন।

'কিছুতেই না, ওর বাবা মনে করত এভাবে তার মেয়ের বেঁচে থাকার অর্থ মিথ্যা হয়ে বেঁচে থাকা। একটা চরম সত্যকে গোপন করে কোন মেয়েরই বাঁচবার অধিকার নেই।'

'অদ্ভুত যুক্তি! কী দুর্বুদ্ধি পেয়ে বসেছিল লোকটাকে। তারপর?' আমি আবার দাঁতে দাঁত ঘষছিলাম।

মিঃ রায় আবার হাসছিলেন।

'তারপর আর কদিন মেয়ের খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন লোকটা যেন আরো ক্ষেপে গেল। রাস্তায় কোন মেয়ে দেখলে কটমট করে তাকিয়ে দেখত, ভাবত ঐ বুঝি তার মেয়ে যাচ্ছে। দরকার হলে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ত।'

আমার নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল, তাঁর মুখের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল। 'তারপর?' কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যেমন সূর্যের দিকে তাকাতে চোখ জ্বালা করে তবু তাকাতে ইচ্ছা করে। 'মানে কলকাতায় থেকে থাকলেও ভদ্রভাবে যাতে নিজের অ[illegible] বজায় রেখে মেয়েটি চলতে না পারে বাপ তাই চাইছিল?'

'হুঁ', মিঃ রায় তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করলেন, 'এই ভদ্রতা তাঁর

ওপরের খোলস হত মাত্র, সত্যিকারের চেহারা হত না।' একটু থেমে থেকে তিনি বললেন: 'শহরের এই স্টুডিও সেই স্টুডিও ঘুরে পাগল অনেকগুলো মেয়ের ফটো জোগাড় করেছিল। সেই মুখ-গুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবত তার মেয়ের মতো আর একটি মেয়েও এমন ভুল করেছিল কি না বা কোনদিন করবে কি না।'

'কিন্তু মুখ দেখে কি সে মেয়েদের মন বুঝতে পারত—চরিত্র?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

মিঃ রায় আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'পারে নি, পারত না, তাই হতাশ হয়ে একলা ঘরে পায়চারি করত আর মাথার চুল ছিঁড়ত।'

'তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল। ওই মেয়ের জন্য মরেছিল।' এতক্ষণ পর আমি কথাটা বললাম, যেন না বললে অপরাধ হত। 'আর তার কিছুদিন পরে ছেলে ট্যাক্সি চাপা পড়ে মারা গেল।'

'ও, তা হলে তুমি ইতিমধ্যে খবর জোগাড় করেছ!' মিঃ রায় নতুন করে হাসলেন। 'করবেই তো, খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়েছ যখন।'

'আমার তো মনে হয়—' রাগটা কমছিল, অবাক হলাম, মাথা-খারাপ লোকটার প্রতি একটু একটু করে যেন সহানুভূতি জাগছিল। বললাম, 'মানুষটার মন বিগড়ে যাওয়া মাথা নষ্ট হওয়ার পিছনে এই দুটো মৃত্যুও কাজ করেছিল।'

মিঃ রায় চোখ সরিয়ে দেওয়াল দেখতে লাগলেন।

আমি ছটফট করছিলাম, অস্বস্তিবোধ করছিলাম আর একবার খবরটা শুনতে, ভাল করে জানতে।

'সত্যি কি সেই পাগলকে সেই নিষ্ঠুরকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'সত্যি সে-মানুষ আর নেই।' মিঃ রায়ের দুটো হাত আমার কাঁধের ওপর নেমে এল। তাঁর দৃষ্টি আবার উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। 'Now I am a changed man—আমি এখন অন্য

মানুষ অন্য বাপ—কেননা আমি তোমায় পেয়ে গেছি বিনু। একটি পুরুষ ছাড়া ও বাঁচত কি করে।' তাঁর গাঢ় তপ্ত নিশ্বাস আমার কপালে লাগছিল, যেন আবেগে তিনি একটু একটু কাঁপছিলেন।

'এখন আমার ইরা সুখী হবে, ওর সুখ আমাকে সান্ত্বনা দেবে—কেননা এমন একটি পুরুষের কাছে থাকবে ও যে তার সত্য মিথ্যা সব জানবে।' মিঃ রায় হঠাৎ থেমে গেলেন। যেন তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল। আমার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে তিনি আর একটু পায়চারি করলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন।

'তা ছাড়া আর যেভাবেই সে বেঁচে থাকত—যার কাছেই থাকত একটা ভাণ একটা মিথ্যা নিয়ে তাকে বাঁচতে হত, আর সারাজীবন একটা Complex নিয়ে ভুগত, সেই জীবন বড় মর্মান্তিক—তাই নয় কি, বিনু।'

আমার চোখে জল এসে গেল। আমার ঠোঁট কাঁপছিল। আমি না বলে পারলাম না।

'আপনার ঘড়িটা বিক্রী করে টাকা জোগাড় করে আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম।'

'তাই তো তুমি যাবে।' মিঃ রায় দরাজ গলায় হাসলেন: 'আমার সর্বস্ব বেচে দিয়ে যদি তুমি তার কাছে যেতে রাগ করতাম না। কেননা তুমি তো তাকে বাঁচাবে—তুমি তো তাকে বাঁচালে—আর আমি আমার সর্বস্ব ফিরে পেলাম। যাও—তুমি কি বাথরুমে যাবে—চট্‌ করে সেরে এসো, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'কাল ডিক্সন লেনে গিয়ে মীরাকে খবর দিতে হবে না? ওর দিদি এসে গেছে, ইরা ফিরে এসেছে?'

'সবাই জানবে—আমি নিজে গিয়ে সকলকে খবর দেব। দাঁড়াও, সাকুরার ম্যানেজারকে বলে দিচ্ছি রাস্তায় এক আধটা ট্যাক্সি দেখলে যেন আটকায়। তুমি সেরে এসো—পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা বেড়িয়ে পড়ব।' মিঃ রায় টেলিফোন্ তুললেন।

বাথরুমে ঢুকে হঠাৎ আমার কথাটা মনে হল। এমন একটা আশ্চর্য খবর যুগভেরীতে ছাপতে দেওয়া যায় না কি। পরক্ষণে অবশ্য মনে মনে হাসলাম। সব খবরই কিছু কাগজে ছাপা যায় না। পৃথিবীতে এমন খবর আছে যা শুধু মনে রাখতে হৃদয়ের তাপ দিয়ে লালন করতেই ভাল লাগে।